# আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই

সাদাত হোসাইন

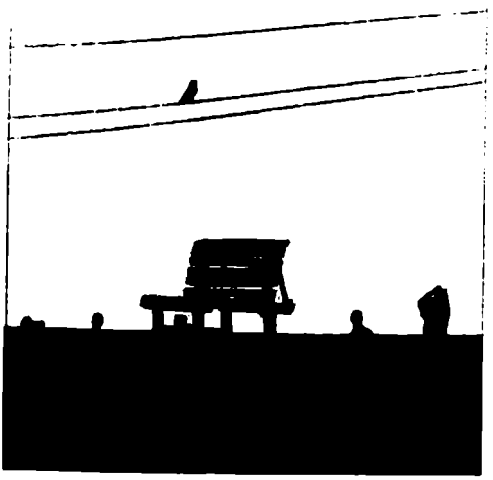

বাদল খুব ধীরে, আলতো হাতে লাবণীর গাল ছুঁয়ে দিলো। সেখানে জলের দাগ। বাদল সেই জলের দাগ ছুঁয়ে কেমন অন্য কেউ হয়ে গেল। অন্যরকম অচেনা কেউ। তার গলা ভারী হয়ে এলো। সে ভিজে গলায় ফিসফিস করে বললো, 'যা পাওয়া হয় না, তা-ই হয়তো আরও বেশি রয়ে যায় চিরকাল'।

বাদল কি কাঁদল?

ISBN : 978-984-90873-3-5

# আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই

সাদাত হোসাইন

ভাষাচিত্র

# আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই

সাদাত হোসাইন

**প্রকাশক**
খন্দকার মনিরুল ইসলাম
**ভাষাচিত্র** ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০, হাতফোন : ০১৭১১ ৩২৪ ৬৪৪
**প্রথম প্রকাশ** একুশে বইমেলা ২০১৪
**দ্বিতীয় মুদ্রণ** একুশে বইমেলা ২০১৪
**স্বত্ব** লেখক
**প্রচ্ছদ** মির্জা মুজাহিদ
**মুদ্রণ** টিমওয়ার্ক
**মূল্য** ১৫০ টাকা

---

**AMAR AR KOTHAO JAOAR NEI**
a novel by Sadat Hossain
First Published : Ekushey Boimela 2014
Published by **BHASHACHITRA**
Islami Tower, 2nd Floor
11 Banglabazar, Dhaka 1100
Cell : 01711 324 644
E-mail : bhashachitra@gmail.com

Price : Tk 150 US $ 7

ISBN : 978-984-90873-3-5

## উৎসর্গ

ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরেই তার গা ঘেঁষে বসতাম। শরীরে তেমন সাড় নেই বলে দিনরাত পড়ে থাকতেন বিছানায়। কানে শোনেন না। ঠিকমতো চোখেও দেখেন না। আমি চুপচাপ বসে থাকতাম। কথা বলতাম না। কি করে চিনবেন তিনি? কিন্তু তিনি চিনতেন। অদ্ভুত উপায়ে চিনতেন। তার কোঁচকানো হাত কেঁপে কেঁপে চষে বেড়াতো আমার মুখ, গলা, ঘাড়, চুল। আমার গায়ের সাথে নাক ঘঁষে ঘঁষে গন্ধ খুঁজতেন। তার রক্তের ঘ্রাণ? একসময় ঝড়ঝড় করে কেঁদে ফেলতেন, 'ভাই, আইছত?'

আমার দেখা এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। তিনি নেই। কিংবা আছেন। যখনই কেউ প্রবল মমতায় ছুঁয়ে দেয়, মনে হয় তিনি আছেন, তিনি থাকবেন।

আমার দাদী জোবেদা বেগম।

আমার 'বু'।

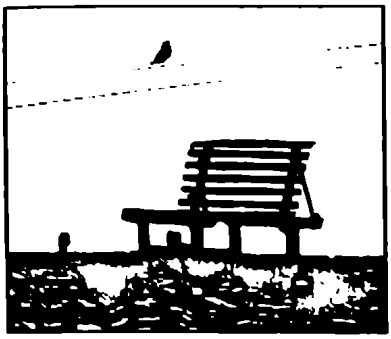

লাবণীর বিয়ে ভেঙে গেছে।

বিয়ে পাত্রপক্ষ ভাঙেনি। ভেঙেছে লাবণী নিজে। বিয়ের কথা একভাবে পাকা হয়েই ছিল। পাত্রের নাম আজাদ। সে দেখতে শুনতে ভালো। উচ্চ শিক্ষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছে। আচার-ব্যবহার ভালো। স্বাভাবিক হিসেবে এই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথা না। বিয়ে স্বাভাবিক হিসেবে ভাঙেওনি। ভেঙেছে অদ্ভুত হিসেবে। আজাদ লাবণীকে দেখতে এসে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। এই তুমি বলার কারণে বিয়ে ভেঙে গেছে। বিষয়টা লাবণীর পছন্দ হয়নি। তার ধারণা, যে ছেলে পাত্রী দেখতে এসেই পাত্রীকে তুমি বলে সম্বোধন করে, সে বিয়ের দুই দিন পর থেকে 'তুই-তোকারি' শুরু করবে। কথায় কথায় গায়ে হাত তুলবে। লাবণী ছেলের মুখের উপর বলে দিয়েছে, 'আপনার ভদ্রতা জ্ঞানের অভাব আছে। যেই ছেলের ভদ্রতা জ্ঞানের অভাব আছে তাকে আমি বিয়ে করবো না।'

লাবণীর বাবা আজাহার উদ্দিন অবশ্য এই 'তুমি সম্বোধন' সংক্রান্ত সমস্যাটি বিশ্বাস করছেন না। তার ধারণা এটা বিয়ে না করার একটা বাহানা মাত্র। এর পেছনে অন্য ঘটনা আছে। সেই ঘটনা হচ্ছে লজিং মাস্টার বাদল। বাদলকে নিয়ে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। তিনি বাদলের ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছেন। তবে লাবণীর বিষয়টা নিয়ে তিনি খানিকটা বিরক্ত। এবারেই প্রথম না। এর আগেও দুবার লাবণী তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে। আজাহার উদ্দিন আছরের নামাজ পড়ে দোতলার টানা বারান্দার এপাশ থেকে ওপাশে ক্রমাগত পায়চারি করছেন। তার হাতে হাকিমপুরী জর্দা দিয়ে বানানো পান। তিনি আঙুলের ডগা থেকে চুন নিয়ে মুখে দিচ্ছেন কিন্তু হাতে ধরা পান মুখে দিতে ভুলে গেছেন।

'আব্বা আমাকে ডেকেছেন?'

লাবণী বারান্দার দরজা দিয়ে ঢুকলো। তার পরনে টকটকে লাল শাড়ি। এই শাড়ি পরেই সে কিছুক্ষণ আগে পাত্রপক্ষের সামনে গিয়েছিল। আজহার

উদ্দিন লাবণীর প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি নানান বিষয় নিয়ে চিন্তিত। কিছু মানুষ দুনিয়াতে আসে ঝামেলা মাথায় নিয়ে। ইনিও তাদের একজন। দুনিয়ার সকল ঝামেলা একসাথে মাথায় নিয়ে বসে আছেন। ঝামেলা মাথায় নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। মাথা থেকে নামাতে হয়। এই নামানোর কাজটা কঠিন। কিন্তু আজহার উদ্দিন জানেন, কঠিন কাজ কিভাবে সহজ করতে হয়।

'তোমার ঘটনাটা আমাকে খুলে বলো'। আজহার উদ্দিন সরাসরি আলোচনায় চলে গেলেন। তার হাতে সময় অল্প।

'কোনো ঘটনা নাই আব্বা'।

'ঘটনা নাই এটা ঠিক না। ঘটনা অবশ্যই আছে। দুনিয়াতে ঘটনা ছাড়া কিছু ঘটে না'।

'এখানে কোনো ঘটনা নাই আব্বা'।

'বুঝলাম ঘটনা নাই। কিন্তু শুনলাম ছেলের আচরণ তোমার পছন্দ হয় নাই?'

লাবণী এই কথার কোন জবাব দিলো না। সে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

'এখনই আচরণ পছন্দ না হওয়ার কিছু নাই। সে এখনো জানে না তোমার পছন্দ-অপছন্দ কি। তুমিও তার পছন্দ-অপছন্দ জানো না। এটার জন্য সময় দরকার। দুইজনের বোঝাপড়া দরকার। সে অতি উচ্চ শিক্ষিত ছেলে। বংশ মর্যাদা ভালো। আমার ধারণা তুমি একটু সময় দিলেই বোঝাবুঝির বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যেত। তুমি তাকে যেই কথা বলছো, তাতে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিয়ে এখনো ভাঙে নাই। না ভাঙার কারণ ছেলের তোমাকে অসম্ভব পছন্দ হয়েছে। সে তোমার সাথে আরেকবার কথা বলতে চায়'।

'এই ছেলেকে আমার পছন্দ না আব্বা।'

'কেন পছন্দ না? সব কিছুর পেছনে কারণ থাকে। আমাকে তুমি একটা কারণ দেখাও যে এই কারণে ছেলে তোমার পছন্দ না'।

লাবণী এই প্রশ্নেরও কোন জবাব দিলো না। সে চুপ করে রইলো। নিচে রান্নাঘরের সামনে মধু মিয়া শামিয়ানা টানাচ্ছে। সন্ধ্যায় বাড়িতে মেহমান আসার কথা। নতুন পুলিশ সুপার এসেছে থানায়। তার সৌজন্যে সামান্য খানা-পিনার আয়োজন।

'পছন্দ-অপছন্দ ইচ্ছার ব্যাপার। ছেলের সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়েই পাকা কথা দিয়েছিলাম। ছেলেও তোমার ছবি দেখেই মত দিয়েছিল। আজ শুধু দেখা সাক্ষাতের বিষয় ছিল। অথচ তুমি তার মুখের উপর বলে দিয়েছো, তার আচরণ খারাপ'।

'আব্বা আমি যাই?'

'যাও। আর তোমার আম্মাকে আমার কাছে পাঠাই দাও। তার সাথে আমার কথা আছে'।

লাবণী বের হওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে ঘাড় ঘুড়িয়ে আজাহার উদ্দিনের দিকে তাকালো। তারপর বাবার চোখে স্থির চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আব্বা, আপনাকে আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ওই মেয়েকে আমার আম্মা বলবেন না। সে বড়জোড় আমার বান্ধবী হতে পারতো। মা না। একটা বাইশ বছরের মেয়ের আঠারো বছরের সন্তান থাকে না'।

মেয়ের আচরণে আজহার উদ্দিন খানিকটা থতমত খেয়ে গেলেন। লাবণীর এই চেহারার সাথে তিনি পরিচিত না। ইদানিং মাঝে মাঝে এই ঘটনা ঘটছে। লাবণী তার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে। তার ভেতর এক ধরনের চাপা ঔদ্ধত্য কাজ করছে। সে চেষ্টা করছে সেটা চেপে রাখতে। কিন্তু সবসময় সেটা চেপে রাখতে পারছে না। সময়ে সময়ে সেটা বের হয়ে আসছে। বিষয়টা নিয়ে আজহার উদ্দিন চিন্তিত। কোনো সমস্যাই বাড়তে দেয়া ঠিক না। লাবণী সমস্যার অতি দ্রুত সমাধান দরকার। মেয়ের কারণে তিনি অন্য সমস্যাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছেন না।

জোহরা বারান্দায় ঢুকলো বেতের মোড়া হাতে নিয়ে। তার কোমড়ে ব্যাথা। সে এই মোড়া ছাড়া বসতে পারে না। যেখানে যায় তার সাথে থাকে বেতের মোড়া। আজহার উদ্দিন জোহরার সামনে চেয়ারে বসলেন। জোহরাকে সুন্দর লাগছে। সে এইমাত্র গোসল করেছে। শেষ বিকেলের আলো পড়েছে জোহরার মুখে। তার গায়ের রঙ লাগছে সোনার মতো। সোনা রঙা জোহরাকে দেখে মনে হচ্ছে পরী। এই পরী যেন এই বাড়ির কেউ না। সে এই বাড়িতে এসেছে নাটক দেখতে। এই বাড়িতে বাবা মেয়ের নাটক চলছে। নাটকে তার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার ভাবখানা এমন যে এই নাটকের সে কিছুই জানে না। তার স্বামী আজহার উদ্দিনের বিষয়েও সে উদাসীন। বাবার বয়সি স্বামীকে নিয়ে অবশ্য আহ্লাদের কিছু নেই। কিন্তু এই বিয়ে সে নিজের ইচ্ছায় করেছে। স্বামীকে সহজ গলায় তুমি

করে ডাকছে। আহ্লাদ না থাকলে বাবার বয়সি একজনকে কেউ আগ্রহ করে বিয়ে করে না।

'তোমার কোমড়ের ব্যাথার কি অবস্থা?'

'সন্ধ্যার দিকটায় একটু বাড়ে। তেমন অসুবিধা না।'

'সুদেব ডাক্তার রেগুলার আসে না? তার তো রেগুলার আসার কথা।'

'আমিই আসতে না বলেছি। পুরুষ ডাক্তার রেগুলার মেয়ে মানুষের ঘরে আসা ঠিক না। বলেছি দরকার হলে খবর দিব।'

'ডাক্তারের কাছে আবার মেয়ে-ছেলে কি? ডাক্তার হলো ডাক্তার। যাই হোক, লাবণীর বিষয়ে তোমার মতামত কি?'

'আমার কোনো মতামত নাই। সে বলেছে ছেলে অভদ্র। অভদ্র ছেলেকে কেউ জেনে শুনে বিয়ে করে না।'

'অভদ্রের কি হলো? ছেলে তাকে তুমি করে বলছে। এতে দোষের তো কিছু দেখি না। দুইদিন পর তো তাদের বিয়েই হওয়ার কথা। তাছাড়া আজাদ বয়সেও তার চেয়ে বড়।'

'মেয়ে মানুষের বয়স বছরে হয় না। মেয়ে মানুষের বয়স হয় শরীরে। এটা তো তোমার ভালো জানার কথা।'

কথা শেষ না করেই জোহরা হা হা হা করে হেসে উঠলো। হাসির দমকে জোহরার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আজহার উদ্দিন কিছু বললেন না। তিনি জোহরার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হাসির সময় মানুষের চোখ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় চোখ অনেক গোপন কথা বলে। কান্নার সময় বলে না। কান্নার সময় চোখে থাকে পানি। সেই পানিতে গোপন কথা থাকে না। থাকে মন দুর্বল করার অস্ত্র।

আজহার উদ্দিন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তার কেন যেন মনে হচ্ছে তিনি খুব ছোট কোনো বিষয় নিয়ে কঠিন বিপদে পড়বেন। কিন্তু সেই ছোট জিনিসটা তিনি ধরতে পারছেন না। সামনে উপজেলা ইলেকশন হওয়ার কথা। তিনি ইলেকশনে সরাসরি নির্বাচন করেন না। বিভিন্ন পদে তার নির্বাচিত প্রার্থী থাকে। তিনি তাদের সমর্থন দেন। তারা বেশিরভাগই ভোটে জেতে। ভোটে জিতে আজহার উদ্দিনের কাছে ঋণে বাঁধা থাকে। তারা চলে আজহার উদ্দিনের কথায়।

'লজিং মাস্টার বাদলের চাকরি হয়েছে শরিয়তপুরে। হাইস্কুলে বাংলার শিক্ষকের চাকরি। এই খবর শুনেছো মনে হয়?'

'হু, শুনেছি'। জোহরা পানের বাটা থেকে একটা পানের বোটা ছিড়ে মুখে দেয়। এই মুহূর্তে তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে সে শরীর কাঁপিয়ে হেসেছে। সে এখন বসে আছে স্থির, শান্ত।

'বাদলের বিষয়ে কিছু ভাবছো?'

'না ভাবি নাই। বাদলের চাকরির ব্যবস্থা যে তুমি করছো এটা কি বাদল বা লাবণী জানে?'

'বাদলের চাকরির ব্যবস্থা আমি করেছি এটা তোমাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নাই, এটা আমার অনুমান'।

'বাদলের চাকরিটা দরকার ছিল। তার বাপ-মা নাই। আছে একমাত্র বোন। সেই বোনের স্বামী নিখোঁজ। বোনের সংসার চালানোর কেউ নাই। এই দায়িত্ব এখন তার। তার পরীক্ষাও শেষের দিকে।'

'কিন্তু তুমি একজনের চাকরির ব্যবস্থা করলা, সে সেটা জানলো না। সে জানে, তার চাকরি হয়েছে ইন্টারভিউ দিয়ে, বিষয়টা কি এতই সরল?'

'সরল ভাবলেই সরল। এর মধ্যে অন্য কিছু ভাবার তো কারণ নাই।'

'আছে। তুমি ভাবছো লাবণী বাদলের জন্যই বারবার বিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। বাদলের সাথে তার কোনো ঘটনা আছে। এই জন্য বাদলকে সরানোর ব্যবস্থা করেছো। তাই তো? কিন্তু আমার মনে হয় আসল ঘটনা অন্য।'

'আসল ঘটনা কি?'

'সেটা তো জানি না। জানলেও তোমাকে বলতাম না। আমাকে বিয়ে করার পর থেকে তোমার মাথার কাজ কমতে শুরু করছে। অন্য জায়গার কাজ বাড়তে শুরু করেছে। কোমড়ের ব্যাথা তো আর আমার এমনি এমনিই হয় নাই।'

জোহরা আবারো শরীর দুলিয়ে হাসলো। আজহার উদ্দিন বারান্দার রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিচে আশফাক সাহেব এসেছেন। আশফাক সাহেব এই এলাকার সাংসদ। প্রতিমন্ত্রীও হয়েছিলেন আগে একবার। তিনি বসে আছেন শামিয়ানার নিচে। লাবণী আশফাক সাহেবের জন্য শরবত নিয়ে গেছে। সে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। আশফাক সাহেব হো হো করে হাসছেন। অতিথিরা আসা শুরু করেছে। আজহার উদ্দিনের এখুনি নিচে নামতে হবে।

দোতলার রেলিং পর্যন্ত উঠেছে পেয়ারা গছের ডাল। দুটো চড়ুই টুকটুক করে এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাচ্ছে। সম্ভবত মা চড়ুই আর তার

ছানা। মা চড়ুই ছানাটাকে ধরতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। সে ভান করছে ধরা দিবে, কিন্তু মা কাছে আসতেই টুক করে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। কানামাছি খেলার মতো। আজহার উদ্দিনের হঠাৎ মনে হলো এই দুনিয়াটাই একটা কানামাছি খেলা। কেউ ধরতে চায়, কেউ পালাতে চায়। আবার কেউ পালাতে চায় ভান করলেও আসলে ধরা পড়তে চায়। সে কোন দলের?

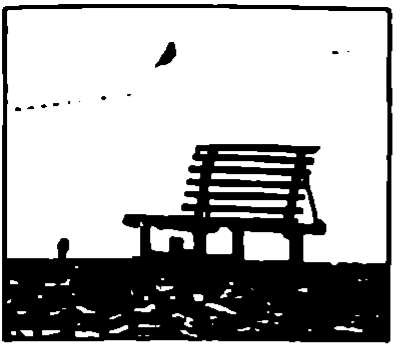

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর।

ভয়াবহ গরম। এই গরমে আম-কাঠাল পাকে। এবার গরমে আম-কাঠালের সাথে আরো একটা জিনিস পেকেছে। সেই জিনিসের নাম ঘামাচি। বিরামপুর গ্রামের সকলের পিঠ ভর্তি ঘামাচি দেখা দিয়েছে। এই অঞ্চলে ঘামাচিকে বলে বিচি। বিচি পেকে টসটসে অবস্থা। কুটকুট করে কামড়ায়। খানিকটা পাউডার মাখতে পারলে ফুরফুরে আরাম। কিন্তু কালুর পক্ষে পাউডার মাখা সম্ভব না। সে কামলা মানুষ। পাউডার তার জন্য না। তার জন্য যেই জিনিস সেই জিনিসের নাম ধুলা। কালু গায়ে ধুলা মেখে বসে আছে। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। এইজন্য গ্রামে তার নাম হয়েছে কালু। সে তার কুচকুচে কালো শরীরে ধুলা মেখে বসে আছে কিন্তু কুটকুটানি থামছে না। সমাধান অবশ্য একটা আছে। খেজুর পাতা দুই ভাঁজ করে যেখানটায় ভাঁজ পড়েছে সেই জায়গাটা দিয়ে টুকুস টুকুস করে বিচি ফোঁটানো। এতে অবশ্য সমস্যাও আছে। বিচি ফোটানোর সময় তীব্র আরাম। আরামে চোখ বুঁজে আসে। কিন্তু ফোটানো শেষ হতেই শুরু হয় জ্বলুনি। মনে হয় সারা শরীরে কেউ লাল পিঁপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

কালু ঘরামির কাজ করে। ছন আর বাঁশের ঘর তৈরির কাজ। তার হাতে চকচকে লম্বা দা। এই দা সে টরকী বন্দরের রঘু কর্মকারের কাছ থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়েছে। রঘু কর্মকার তাকে বলেছিল, 'যেই দাও বানাই দিলাম, এই দাওয়ের কর্ম বাঁশ কাটন না, এই দাওয়ের কর্ম মাইনসের কল্লা কাটন। কোপ পুরা দেওনের দরকার নাই। গলায় ছোঁয়াইলেই কর্ম সাধন'।

কালু অবশ্য দা দিয়ে বাঁশই কাটে। মাঝে মধ্যে অন্য কাজও করে। জয়নাল কসাই বাজারে গরু জবাই দিলে সে তার সাথে মাংস কাটার কাজ করে। এছাড়া আর কিছু না। সে রাবেয়া বানুর ঘরের বাঁশ চাছছে। রাবেয়া বানু পষ্ট বলে দিয়েছে, আজকের মধ্যে বাঁশ চাছা শেষ না হলে কাল থেকে সে অন্য কামলা দেখবে। অল্প বয়সের মেয়ে ছেলের বুদ্ধি কম হয়। বুদ্ধি থাকে গলার কাছে। সেই বুদ্ধি মাথায় যাওয়ার আগেই মুখ দিয়ে বের হয়ে

আসে। এরা সারাক্ষণ ফটরফটর কথা বলে। জগতকে বোঝাতে থাকে, সে মস্ত বড় বুদ্ধির ঢেঁকি। আসলে লবডঙ্কা। কিন্তু রাবেয়া বানুর ঘটনা অন্য। তার বয়স অল্প। পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। কিন্তু বুদ্ধি অল্প না। সে ধীর স্থির। কথাও বলে কম। এই জন্যই কালুর ভয়। এই কাজটা তার দরকার। তার বয়স হয়েছে। সারাজীবনের খেটে খাওয়া বৃদ্ধ শরীর। ক্ষেত-খামারের কাজ আজকাল আর শরীরে সয় না। তাছাড়া মাঠে এবার ফসলও তেমন নেই। গৃহস্থ কামলা নিবে কি?

কালুর সামনে সাত-আট বছরের এক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। রাবেয়া বানুর ছেলে। তার হাতে নারকেল পাতার বাঁশি। এই ছেলের শরীরে হাড় ছাড়া কিছু নেই। হাত দিয়ে পাঁজরের সব হাড় গুণে ফেলা যায়। সে তীব্র শব্দে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে কালুকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনের গায়ে মাটি কেন?' কালু ছেলেটার দিকে তাকালো। তারপর মাটি থেকে আরেক মুঠো ধুলো নিয়ে শরীরে মাখাতে মাখাতে বলল 'এই শরীলভাই তো দাদা ভাই মাটির। মাটি ছাড়া এই দুইন্নায় আর কিছু নাইগো দাদা ভাই। মাটিতেই সব। জন্ম, মরণ, খাইয়া বাইচ্চা থাকন। হগলই মাটি।'

'আপনে মাটি খান?'

'খাই দাদাভাই। আমরা হগলেই খাই। মাটিই তো খাই।'

'কি মাটি খান? কেদা মাটি? না শক্ত মাটি?'

'মাটির আবার রকম কি ভাই? মাটি হইলো মাটি। সোনার চাইয়াও খাঁটি। সব মাটিই সমান।'

'আমি পুদ্দুনিরতন মাটি নিয়াসনু? আপনে খাইবেন। কেদা মাটি। ভিজা ভিজা। আপনের খাইতে সুবিধা হইবো।'

কালু ফিক করে হেসে দেয়। এই বয়সেও তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো ঝিলিক মারে। সে ছেলেটার হাত ধরে টেনে তার পাশে চাটাইয়ে বসায়। ছেলেটাকে তার পছন্দ হয়েছে।

'তোমার নাম কিগো দাদা ভাই?'

'রতন। আপনের?'

এই প্রশ্নে কালু থমকে যায়। সে বিয়ে শাদি করেনি। আত্মীয় স্বজনও তেমন কেউ বেঁচে নেই। নামের বিষয়টা হয়তো এই কারণেই তার মাথায় ছিল না। আসলে নামের বিষয়টা নিয়ে সে অনেক দিন ভাবে নাই। বহুদিন তাকে কেউ তার নামও জিজ্ঞেস করে নি। সেও আর তার নাম নিয়ে ভাবে না। এখন মনে হচ্ছে এটা বিরাট বোকামি হয়েছে। বাচ্চা একটা ছেলের সামনে সে তার নাম বলতে পারছে না। মারাত্মক লজ্জার বিষয়। নাম

জিনিসটা মোটেই হেলাফেলার বিষয় না। কথায় বলে 'নামে নামে মনে টানে'। নাম অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহপাক আদমকে সর্বপ্রথম নামই শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ কালু তার নিজের নামই মনে করতে পারছে না। কি লজ্জা! কি লজ্জা!!

'আপনের নাম আমি জানি। আপনের নাম কালু। আপনের গায়ের রঙ কালা এই জন্য আপনেরে সবাই কালু ডাকে।'

'গরীব মাইনসের নাম থাকে না দাদাভাই। গরীব মাইনসের থাকে কাম। বৃক্ষের যেমন ফলে পরিচয়। গরীব মাইনসের পরিচয় তেমন কামে। যেইদিন থেইকা কাম করতে পারবো না হেইদিন থেইকা গরীবরে কেউ চিনবো নাগো দাদা ভাই।'

'আমরাও তো গরীব। আমাগোতে সবাইরই নাম আছে।'

'নাগো দাদা ভাই, তোমরা গরীব হইবা ক্যান? কে কইছে তোমরা গরীব?'

'কেউ কয় নাই। আমি জানি।'

'কি জানো তুমি?'

'আপনেরে বলা যাইবো না। বললে অসুবিধা আছে।'

'কি অসুবিধা?'

'সেইটাও বলা যাইবো না। আপনের মতো আমার গায়ে ধুলা মাইখা দিবেন?'

'তোমার মায় দেখলে বকবো না?'

'বকবো না। আমি পুদ্দুনিরতন গোসল কইরা তারপর আম্মার কাছে যামু।'

কালুর ছেলেটাকে খুবই পছন্দ হয়েছে। বাচ্চা ছেলে অথচ বড়দের মতো চটাং চটাং কথা বলছে। কালু দেখেছে, তার সাথে আজকাল আর কেউ কথা বলতে চায় না। অথচ ছেলেটা কী আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে! কালু মুঠো করে ধুলো নিয়ে রতনের পিঠে মেখে দিল। ছোট্ট পিঠভর্তি গিজগিজ করছে ঘামাচি।

'আরাম লাগে?'

'লাগে। তয় কম। রাইতে বু'র কাছে শুইলে বু বিচি খুইটা দেয়, তখন বেশি আরাম লাগে।'

'খাজুর গাছের পাতা দিয়া আমি বিচি ফুটাইতে পারি। দিমু নাকি দাদাভাই?'

'না, আম্মায় কইছে বৃষ্টির পানিতে গোসল করলে বিচি মইরা যায়। আর ওঠে না। আইজ বৃষ্টি হইবো। তখন বৃষ্টিতে গোসল করবো।'

'বৃষ্টি হইবো বুঝলা কেমনে?'

'বু কইছে। ছাড়েন। এখন যাই।'

রতন উঠে দাঁড়ায়। কিছুটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসে।

'আপনেরে একটা গোপন কথা কই।'

'কি গোপন কথা?'

'আপনে কইছিলেন না, আমরা গরীব সেইটা ক্যামনে জানি? আপনে এই যে কাজ করতেছেন, আপনের মজুরি দেওনের টাকা কিন্তু আম্মার কাছে নাই। টাকা থাকবো ক্যামনে? আব্বায় চাইর মাস হইলো কোনো টাকা পাঠায় না। চিঠিও পাঠায় না। আমাগো ঘরে ভাত খাওনের চাউলই নাই। আমরা কি খাই জানেন? আমরা খাই কদু। নুন আর পানি দিয়া কদু সিদ্ধ কইরা খাই। আমাগো বাড়িতে মাচা ভর্তি কদু হইছে। আমরা তিনবেলা কদু খাই।'

রতন আর দাঁড়ালো না। সে তার নারকেল পাতার বাঁশিতে প্যাঁপু প্যাঁপু শব্দ তুলে উধাও হলো। কালু অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। সে কিছুটা চিন্তিত। এই ছেলে বয়সের তুলনায় বেশি পেকেছে। কিন্তু তার কথা মিথ্যা বলে মনে হলো না। রাবেয়া বানু গত তিনদিন ধরেই বলছে মজুরীর টাকা হাঁটবার দিবে। আজ হাঁটবার। খানিকবাদেই আছরের আজান পড়বে। কালুর যাওয়ার সময়ও হয়ে এসেছে, কিন্তু রাবেয়া বানুর খবর নাই। টাকা-পয়সা দিবে এমনটাও মনে হচ্ছে না। ঘটনা কি?

রাবেয়া কাপড়ের আঁচলটা শক্ত করে কোমড়ে বেঁধে নেয়। বিলের পানি এর মধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। এবার ভালো বন্যা হবে মনে হচ্ছে। আসুক, বিপদ আসুক। বিপদ একা আসে না। বিপদ আসে দলবল নিয়ে। শেষ জামানায় বিপদ আসবে তজবীহর দানার মতো। এখন শেষ জামানা। এই বিষয়ে রাবেয়া নিশ্চিত। সুতরাং বিপদ আসতে থাকুক। বিলভর্তি জংলি কলমি শাক। রাবেয়া কলমি শাকের লতা তুলতে থাকে। সে দাঁড়িয়ে আছে হাঁটু পানিতে। প্রচন্ড গরম। বিলের পানিও আগুনের মতো গরম। গাছের পাতা স্থির। কোথাও এক ফোটা বাতাস পর্যন্ত নাই। যে কোনো সময় বৃষ্টি হবে। কিন্তু রতনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এই ছেলে কারো কথা শোনে না। নিজের জগতে থাকে। সারাদিন তিড়িংবিড়িং। বাপ বেঁচে আছে না মরে

গেছে, সেই খবর নাই। সে আছে নিজের ধান্ধায়। এই মুহূর্তে আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ওঁত পেতে আছে। সময় মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। মানুষ সময়ের অপেক্ষা করে না। কিন্তু প্রকৃতি করে। প্রকৃতি সময় ছাড়া কিছু করে না।

রাবেয়া আঁচল ভর্তি কলমি শাক নিয়ে উঠানে পা রাখে। তার শাশুড়ি লতিফা বানু মাচা থেকে লাউ কাটছে। উঠানজুড়ে লাউয়ের মাচা। লাউয়ের ফলন এবার ভালো হয়েছে। মাচাভর্তি লাউ। লতিফা বানু এই লাউ হাটে পাঠাবেন। তিনি সংসারের অবস্থা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। তিনদিন যাবত ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত নাই। থাকবে কি করে? চার মাস ধরে ফরিদের কোনো খোঁজ-খবর নাই। একটা চিঠিও দিচ্ছে না ছেলেটা। মা হওয়ার নানান যন্ত্রণা। বুকের ভেতরটা কেবল আঁকুপাকু করে। ছেলের চিন্তা, বউয়ের চিন্ত া। এইটুক নাতিটা প্রতিবেলা খেতে বসে চুপচাপ বসে থাকে। কান্নাকাটি নাই। ঝিম ধরে বসে থাকে। এই এক চিন্তা। তিনি নাতিকে নানান উপায়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করেন।

'দাদা ভাই, এইবেলা খাইয়া নেও। কি সোন্দর কচি কদু। মুখে দিলে রসগোল্লার লাহান গইল্লা যায়।'

'আমার খিদা নাই বু।'

'খিদা নাই এইটা ঠিক না। খিদা আছে। এই বয়সটা হইলো খাওনের বয়স। খিদা থাকলেও খাইবা, না থাকলেও খাইবা।'

'আমি খামু না।'

'না খাইলে তো শরীল ঠিক থাকবো না দাদা ভাই। এই বয়সে শরীল ঠিক রাখন দরকার।'

'আমার শরীল ঠিক আছে। বেয়ানে এত্তগুলা কদু খাইছি। রসগোল্লার লাহান কদু। মুখে দেওনের সাথে সাথে গইল্লা পেটে চইলা গেছে।'

'এখন তো রাইত। সারাদিনে তো আর কিছু খাও নাই। প্রত্যেক বেলায় অল্প অল্প খাইতে হয়। নাইলে শরীল ঠিক থাকে না। শাস্ত্রে আছে, উনা ভাতে দুনা বল, নিত্য উনা রসাতল।'

'এইটার মানে কি?'

'এইটার মানে হইলো গিয়া, একবারে বেশি খাওন ভালো না, পেট খালি রাইখা খাওন ভালো। কিন্তু প্রত্যেক বেলাই খাইতে হইবো।'

'আপনে ভাতের কথা কইছেন। আমি তো ভাত খাই নাই। ভাত থাকলে প্রত্যেক বেলাই খাইতাম। পেট ভইরা গপগপ কইরা খাইতাম।'

এইখানে এসে লতিফা বানু বলার মতো আর কিছু খুঁজে পান না। নাতির সাথে তিনিও ঝিম ধরে বসে থাকেন। তার খুব ইচ্ছে হয় কচি মুরগীর কসানো শালুন দিয়ে ধোঁয়া ওঠা ধবধবে সাদা ভাত মাখিয়ে নলার পর নলা রতনের মুখে তুলে দিতে।

লতিফা বানু লাউ কেটে ঝাঁকা ভর্তি করছেন। পাশের বাড়ির ফজলুকে দিয়ে ঝাঁকাভর্তি লাউ হাটে পাঠাবেন। এই কাজটা রতনই করতে পারতো। গ্রামের বাচ্চাকাচ্চারা এই কাজ হরহামেশা করে। কিন্তু রতনকে বলে লাভ নেই। সে এসবের ধার ধারে না। ফজলুকে অবশ্য লাউ বিক্রির উপর কমিশন দিতে হবে। কিন্তু এছাড়া উপায় কি? রাবেয়া এই বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলছে না। তার আশঙ্কা, এই লাউ হাটে বিক্রি হবে না। বিক্রি হবার কথাও না। গ্রামে সকলের বাড়ির উঠানেই মাচা আছে। এবার লাউয়ের ফলন ভালো হয়েছে। সবার মাচাভর্তিই গিজগিজ করছে লাউ।

'বৌ, কদু কয়টা দিমু কও তো?'

'আপনের ইচ্ছা আম্মা।'

'এইটা কেমুন কথা বউ? বিপদে আপদে সব কাজই করতে হয় শলা-পরামিশ কইরা। একজনের বুদ্ধি তখন কাজ করে না।'

রাবেয়া এই কথার কোনো জবাব দেয় না। সে দা নিয়ে শাক কাটতে বসে যায়।

'ফরিদের উপর তুমি রাগ কইরো না বউ। পোলাডা সহজ-সরল। বাপ মরা পোলা, মাইনষের লাথি-গুঁতা খাইয়া বড় হইছে। কিন্তু ভিতরটা সাদা। তুমি দেইখো বউ, সে আচমকা আইসা হাজির হইবো। আমি খোয়াব দেখছি। দেখি, সে বাড়ির দরজায় আইসা মা মা কইয়া ডাকতেছে। তার মুখভর্তি দাড়ি। তারে দেইখা লাগতেছে তোমার শ্বশুড়ের লাহান। তোমার শ্বশুড়ের গায়ের রঙও আছিল অমন টকটকা ধলা। আমি কইলাম, কি বাজান, তুই আছিলি কই? সে কয়, কোথাও আছিলাম না মা। গ্রামেই আছিলাম। দেখলাম, তোমরা আমার লাইগা কেমন পেরেশান হও। আমি কইলাম, এইটা কেমুন কথা? আমরা তোর চিন্তায় চিন্তায় শেষ। সে বলল, এইটাই কথা মা। মানুষ চোউক্ষের সামনে থাকলে তার গুরুত্ব বোঝা যায় না। গুরুত্ব বোঝা যায় যখন সে চোউক্ষের আড়াল হয় তখন। এই জন্যই চোউক্ষের আড়াল হইছিলাম। এই কথা বইলা তার কি হাসি। আমি তারে কইলাম, যা নাপিতের কাছ থেইকা দাড়ি কাইট্টা আয়। আমি ভাত দিতেছি। সে কয়,

ভাত দিবা কেমনে মা? ঘরে তো চাউল নাই। তোমরা হইছো কদু পরিবার। তিনবেলা কদু খাও। চিন্তা নাই। আমি বাজার নিয়া আসছি। এই ব্যাগে চাউল আছে। নাজিরশাইল চাউল। কচি মুরগী নিয়াসছি এক হালি। নতুন আলুও আছে। শচীন ঘোষের দোকানেরতন দই আনছি। কসাইয়া শালুন রান্ধ। সবাই মিল্লা আইজকা মুরগীর শালুন দিয়া ভাত খামু। ভাত শেষে দই। কই, আমার বাজানে কই? রতন কই? সে বাড়ি মাথায় তুইলা রতনরে ডাকতেছে, এই সময় আমার ঘুম ভাইঙ্গা গেল বউ। দেখি তুমি রতনরে ঘুমেরতন ডাকতেছো। ফজরের আজান হইতেছে। শেষ রাইতের খোয়াব সত্য হয় বউ।'

'সত্য হইলেই ভালো আম্মা।'

রাবেয়া এর বেশি কিছু বলে না। সে শাক ধুতে পুকুরে যাবে। রান্নাঘরে চালুনি খুঁজছে। পুকুরে খেজুর গাছ দিয়ে ঘাট দেয়া হয়েছে। ঘাটের দুই পাশে পুঁটি মাছ, মলা মাছ, ছোট চিংড়ির পোনা ভিড় করে থাকে। চালুনি খেয়ালে দু'চারটা উঠে আসে। কলমি শাকের সাথে দুটো মলা-ঢেলা মাছ রেঁধে দিতে পারলে যদি রতন মুখে তোলে।

আকাশ কালো করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাগরিবের ওয়াক্ত হয়েছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। রতন এখনো ঘরে ফেরেনি। ফজলু লাউয়ের ঝাঁকা নিয়ে লতিফা বানুর সামনে বসে আছে। ঝাঁকাভর্তি লাউ। মোট ছয়টা। সে একটা লাউও বেচতে পারেনি। ফেরত নিয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে তার শরীর। গাল বেয়ে পানি ঝড়ছে। ফজলু প্রায়ই মাটি কাটার কাজ করে। ষাঁড়ের মতো শক্ত শরীর। কুঁতকুঁতে চোখ। সেই চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।

'হুনেন চাচী, কদু বিক্রি হইবো কেমনে? হাঁটে তো লোকই নাই। হাঁট জমে সন্ধ্যার আগে আগে। হেইসময় নামলো বিষ্টি। আকাশ ফাডাইয়া ঠাডা পড়ন শুরু করলো। ঠাডার শব্দ হুনলে আবার কই মাছ পানি ছাইড়া উপরে উইঠ্যা আহে। ইশকুলের পুষ্কুনির সব কই মাছ কানে হাইট্যা উইঠ্যা আসলো মাঠে। মানুষ তখন হাঁট করবো, না কই মাছ টোকাইবো? পুরা হাঁট হইয়া গেলো ফাঁকা।'

লতিফা বানু অসহায় দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ফজলুর কথা তার কানে যাচ্ছে না। তার অসহায় লাগছে। রাবেয়া হারিকেনের চিমনি মুছছে। অনেকক্ষণ থেকে মুছছে। যেন হারিকেনের চিমনি মোছা ছাড়া জগৎ-

সংসারে তার আর কোনো কাজ নেই। যেন এই কাজ শেষ হলেই তাকে আরো একটা সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হবে। সে এই মুহূর্তে আর কোনো সমস্যার সামনে দাঁড়াতে চায় না। সে সবকিছু থেকে পালাতে চায়।

কালুর খক খক কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে এসে ঘরের দাওয়ায় বসে। ঘরের খুঁটিগুলো নড়বড়ে হয়ে আছে। ঝড়ো বাতাস হলেই যে কোনো সময় ভেঙে পড়বে। সে তার বাঁশ চাছার কাজ শেষ করে ফেলেছে। এখন বাঁশের খুঁটিগুলো ঘরের চারপাশে পুঁতে ফেললেই হলো। কিন্তু তার মজুরির কি হবে?

'ও বৌমা, বেলা তো শেষ হইয়া আইলো। আমারে কিছু টাকা-পয়সা তো দেওন লাগে মা। বাজার সদায় কিছু করণ লাগতো'।

রাবেয়া ধীরে সুস্থে হারিকেনে চিমনিটা লাগায়। তারপর ঘরে ঢুকে যায়। খানিকবাদে বেরিয়ে আসে। তার হাতে একটা চকচকে একশ টাকার নোট। সে নোটটা কালুর হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলে, 'চাইর দিনে আপনের মজুরি হইছে একশ বাইট টাকা। এখন একশ টাকা রাখেন। বাকিটা দুয়েক দিনের মইধ্যে পাইয়া যাবেন।'

লতিফা বানু থ' হয়ে গেছেন। তিনি হা করে তাকিয়ে আছেন কালুর হাতের চকচকে নোটটার দিকে। রাবেয়া ফজলুর সামনের লাউয়ের ঝাঁকা থেকে একটা লাউ নিয়ে দাওয়ায় বসে যায়। তারপর লাউ কুটতে থাকে। কালু চুপচাপ ফজলুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। তার তাড়া আছে, হাঁটে যেতে হবে।

লতিফা বানু রাবেয়ার পাশে এসে বসেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'বউ তুমি টাকা পাইলা কই?'

'আমার কাছে আছিলো আম্মা।'

'এই কয়দিন তাইলে টাকাটা বাইর করো নাই কেন বউ? রতনডা একমুঠ ভাত খাওনের লাইগা কেমন করতেছে।'

'আমরা খাইয়া আছি নাকি না-খাইয়া আছি এইটা মানুষ দেখে না আম্মা। ঘরডা ভাইঙ্গা পড়লে তখন সবাই দেখবো। আপনের ঘরে জোয়ান বউ। এইটা আপনের মাথায় নাই। গেরামের অনেকেরই মাথায়ই এইটা আছে আম্মা। আপনের পোলার কোনো খবর নাই। বাড়িতে আপনে আর আমি একলা থাকি, এইটাও তাগোর মাথায় আছে। আপনে অনেক কিছু টের পান না, আমি পাই।'

'কি হইছে বউ, তুমি আমারে কও, কেউ কিছু কইছে তোমারে?'

রাবেয়া জবাব দেয় না। সে এক মনে লাউ কুটতে থাকে। কুটতেই থাকে। লাউয়ের ফালিগুলো ছোট হতে হতে মিইয়ে যেতে থাকে। টুকরোর ভেতরে টুকরো। রাবেয়া টুকরোগুলোও আবার কাটে। কাটতেই থাকে। তার শরীরে যেন কিছু একটা ভর করেছে। সে কোনোদিকে তাকায় না। তার হাত ঝড়ের বেগে লাউয়ের টুকরোগুলোকে চকচকে বটির ওপর ঘচঘচ করে কেটে চলে। লতিফা বানু রাবেয়ার গা ঘেঁষে আরো সরে আসেন। আলতো করে রাবেয়ার পিঠে হাত রাখেন। রাবেয়ার শরীরটা যেন কেঁপে ওঠে। লতিফা বানু রাবেয়ার মুখটা তার বুকের সাথে চেপে ধরেন। রাবেয়ার যেন বাঁধ ভেঙে যায়। সে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

'মানুষটার কি হইছে আম্মা? একটা খবর পর্যন্ত নাই। পোলাডার মুখের দিকে তাকাইতে পারি না আম্মা। এক মুঠ ভাত দিতে পারি না। মুখ ফুইটা কিছু কয় না। বাপের কথা জিগায় না। হেইদিন দেখি পুদ্দুনির পাড় কদম গাছটার লগে একলা একলা কথা কয়। তার আব্বার কথা জিগায়। মানুষটার কি হইছে আম্মা। মানুষটা কই আছে?'

রাবেয়া হুহু করে কাঁদে। লতিফা বানু কোনো কথা বলেন না। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। সন্ধ্যা খুব রহস্যময় সময়। এই সময় আলোর জগতকে কে গিলে ফেলে অন্ধকার। তিনি সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে তাকিয়ে থাকেন। মাগরিবের আজান হচ্ছে কোথাও। বুকের ভেতরটা কেমন গুমোট হয়ে আছে। প্রবল বৃষ্টির তোড়ে লতিফা বানুর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

রতন খেতে বসেছে।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো রতনের প্লেট ভর্তি ভাত। শুধু ভাতই না, ভাতের প্লেটের অর্ধেকটা জুড়ে ঝাল ঝাল করে রাঁধা কচি মুরগীর কসানো শালুন। ঘন ঝোলের ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আলুর টুকরা। গরম ভাত থেকে গলগলে ধোঁয়া উঠছে। সমস্যা হচ্ছে ভাত খেতে বসে রতন আবিষ্কার করেছে তার খিদে নেই। শুধু যে খিদে নেই তা না, তার মনে হচ্ছে তার পেট ঠেসে ঠেসে গলা পর্যন্ত ভরা। ভাত তুলে মুখে দিলেই সে হড়হড় করে বমি করে ফেলবে। কিন্তু এই কথা সে কাউকে বলতে পারছে না। তার পাশে বাদল মামা বসা। সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাদল মামা হাজির। তার হাতভর্তি বাজারের ব্যাগ। বারান্দায়

ব্যাগ রাখতে রাখতে সে বাড়ি মাথায় তুলে ডাকলো, 'ও বুবু, বুবু, গামছা দাও, গামছা।'

রাবেয়া বারান্দায় এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বাদলকে দেখে তার মাথা কাজ করছে না। তার মনে হচ্ছে সে ভুল দেখছে। টেনশনে চিন্তায় তার মাথা আউলা হয়ে গেছে। বাদলের এইসময় থাকার কথা মাদারীপুর শহরে, বিরামপুর গ্রামে না। বাদলের বিএ পরীক্ষা চলছে। তার এখন মাদারীপুর শহরের লজিং বাড়িতে বসে গুনগুন করে পড়াশোনা করার কথা। এখানে সে কি করছে? বাদল রাবেয়ার শাড়ির আঁচল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, 'কি ব্যাপার বুবু, তুমি তো দেখি স্ট্যাচু অফ লিবার্টির বিরামপুর ভার্সন হয়ে গেছ? ঘটনা কি? ঘটনা পরে শুনবো। তুমি আগে দেখো, ঘরে দুলাভাইয়ের শুকনা কোনো কাপড় আছে কি-না। থাকলে দাও। আর রান্না বান্না শুরু করো। খিচুরি খাইতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আসার সময় তো আর বুঝি নাই যে বিরামপুরের বৃষ্টির এমন বিরামহীন অবস্থা। ডাল আনি নাই, শুধু চাল আনছি। সাথে মুরগী আছে, নতুন আলু আছে। রান্না চড়াও। কই, আমার দ্য গ্রেট মামুজান কই?'

বাদল আসতেই যেন ঘরের আবহাওয়া পাল্টে গেল। রাবেয়া আর লতিফা বানু রান্না করতে বসে গেলেন। ছোট্ট ঘরটায় কেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব চলে এলো। কিন্তু খেতে বসে রতন পড়েছে মহাবিপদে। সে এখন বাদল মামাকে কি করে বলবে যে তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

'কিরে ব্যাটা খাচ্ছিস না ক্যান? খাওয়া সামনে নিয়ে বসে থাকতে নাই। গপগপ গিলে ফেলতে হয়। মুখে দাও আর গপ করে গিলে ফেলো।'

'খাইতে ইচ্ছা করতেছে না মামা। বমি লাগতেছে।'

বাদল রতনকে কোলে টেনে নেয়। তারপর ভাতের প্লেটটা হাতে নিয়ে ভাত মাখাতে থাকে। মামার কোলে বসে রতনের কেমন লজ্জা লাগে। সে এখন বড় হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ তা বুঝতে চায় না।

'আব্বা আসে না বলে মন খারাপ নাকিরে ব্যাটা? মন খারাপ খুব বাজে জিনিস। এই জিনিস সব জিনিস খেয়ে ফেলে। খিদাও খেয়ে ফেলে।'

রতন না বোধক মাথা নাড়ে। তার মন খারাপ না। বাদল মামা বলেছে, পুরুষ মানুষের মন খারাপ করতে নেই। পুরুষ মানুষ হবে পাথরের মতো শক্ত। রতন অবশ্য কখনো পাথর জিনিসটা দেখেনি। কিন্তু সে আন্দাজ করতে পেরেছে, পাথর খুব শক্তপোক্ত কিছু একটা হবে। বাদল ভাত মেখে নলা তুলে দেয় রতনের মুখে। রতন হা করে গিলে নেয়। অনেকদিন পর তার জিভ ভাতের স্বাদ পায়। বহুদিনের লুকিয়ে থাকা খিদেটা যেন জেগে

ওঠে। কিন্তু রতনের কান্না পেয়ে যায়। তার খুব বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা তাকে কাঁধে করে রোজ নদীর ঘাটে নিয়ে যেত। এভাবে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতো। খেতে না চাইলে গল্প শোনাতো। গল্প শেষ হতেই রতনের হঠাৎ খেয়াল হতো, আরিহ, সে তো সবটুকু ভাত খেয়ে ফেলেছে! রতনের চোখে জল এসে যায়। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কান্না আটকাতে। বাদল মামা বলেছে, ব্যাটাছেলেরা নাকি কাঁদে না। কাঁদে মেয়েছেলেরা। সে তো আর মেয়েছেলে না। সে হলো গিয়ে দ্য গ্রেট মামুজান।

'বুঝলি রতন, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আফসোস করা ঠিক না। খাওয়া-দাওয়া হলো রিজিকের বিষয়। রিজিকে থাকলে খাবি, না থাকলে খাবি না। কি ঠিক বলেছি?'

রতন কথা বলে না। বাদল মামার সব কথাই তার ঠিক মনে হয়।

'জীবনটা হলো পরীক্ষার রুটিনের মতোন। বাংলার পর অংক, অংকের পর ইংরেজি। কখন কি হবে সব সেই রুটিনেই ঠিক করা থাকে। এইটা নিয়া মন খারাপের কিছু নাই। তবে মাঝে মধ্যে রুটিনেও যেমন কিছু ওলটপালট হয়। জীবনেও হয়। এই যে ধর আমার বিএ পরীক্ষা, পরীক্ষার রুটিনে ছিল আজকে আমার শেষ পরীক্ষা। কিন্তু আজকে আমি কই? আমি পরীক্ষার হল রেখে বসে আছি বিরামপুর। কারণ, পরীক্ষার রুটিন ওলটপালট হইছে। ঢাকায় সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করতেছে, সেই আন্দোলনের কারণে পরীক্ষা বন্ধ। কি ক্লিয়ার?'

রতন মাথা নাড়লো, সে ক্লিয়ার। রাবেয়া একগাদা হাড়ি পাতিল নিয়ে ঘরে ঢুকলো। হাতের কুপিটা ফু দিয়ে নিভিয়ে মেঝেতে রেখে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই পরীক্ষাটা তাইলে আবার কবে হইবো?'

'পরীক্ষা কবে হবে জানি না বুবু। জানার দরকারও নাই। যেইদিন হওয়ার কথা সেইদিনই হবে। তোমারে আসল খবর দিতেই ভুলে গেছি। আমার চাকরি হয়েছে। মাস্টারির চাকরি। শরীয়তপুরের এক হাইস্কুলে। স্কুলের নাম অন্নপূর্ণা। কি সুন্দর নাম'।

'আলহামদুলিল্লাহ। লজিং বাড়ি ছাড়বি কবে?'

'লজিং বাড়ি ছাড়া নিয়া এতো অস্থির হইছো কেন বুবু? ভাবছি লজিং বাড়ি ছাড়বো না। এই বাড়িতে স্থায়ী বসত গাড়বো'।

'এইডা কেমন কথা! যাগো নুন খাইছস, তাগো লগে নেমক হারামি করবি?'

'না, নুনের দাম উসুল করবো বুবু। তাদের কন্যা বিয়ে করবো। কন্যা বিয়া করে কন্যা দায় থেকে মুক্তি দিবো।'

'বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না বাদল। বাড়াবাড়ির ফল ভালো হয় না।'

'সেইটাই বুবু। আমিও তাদের সেইটাই বুঝাতে পারলাম না। তারা যে বাড়াবাড়ি করতেছে এটার ফল তো ভালো হবে না। কন্যা তো আমার মতো সহজ জিনিস না। সে বিশাল ডেঞ্জারাস জিনিস। ঘটনা ঘটে গেলে কিছু করার থাকবে না।'

'কি ঘটনা ঘটবে?'

'সেটা আমি কেমনে বলবো? ঘটনা তো আমি ঘটাবো না। ঘটনা যে ঘটাবে সে বলতে পারবে। আমার কাজ এখন শরিয়তপুর যাওয়া, তারপর আল্লাহর নাম নিয়া মাস্টারি শুরু করা।'

'তোর দুলাভাইর বিষয় নিয়া কিছু ভাবছোস?'

ভাবছি। সে আছে এখন জেলে। ঢাকা শহরে এখন রাস্তাঘাটে যাকে পাচ্ছে তাকেই জেলে ঢুকাচ্ছে। তাকেও ঢুকাইছে।'

'তারে জেলে ঢুকাইবো কেন? সে চোর, না ডাকাইত?'

'দিন বদলাইছে বুবু। এখন চোর ডাকাত জেলে থাকে না। জেলে থাকে ভালো মানুষ। এরা চুপচাপ জেলখানার ফুল গাছে পানি দেয়, মাঠের আগাছা বাছে, কাগজের ঠোঙ্গা বানায়। আর চোর ডাকাত জেলে থাকলে নানান ঝামেলা। এরা জেলের বাইরেও যেমন যন্ত্রণা, ভিতরেও যন্ত্রণা। সেধে সেধে কে যন্ত্রণা কাঁধে নেয়?'

'আন্দাজে কথা কইস না বাদল। কোনো খবর থাকলে ক। না থাকলে খবরের ব্যবস্থা কর।'

'কোনো খবর নাই বুবু। নানান চেষ্টা করেছি। খবর নাই। দুলাভাই যেই মেসে থাকতো সেই মেসে খবর নিয়েছি, যেই গ্যারেজ থেকে বেবিটেক্সি নিয়া চালাতো সেখানেও খবর নিয়েছি। তারা কেউ কিছু জানে না। ঘটনার দিন অনেক রাতে বেবিটেক্সি নিয়ে গ্যারেজে ফিরছে। বেবি টেক্সি গ্যারেজে জমা দিয়ে গ্যারেজ থেকে বের হয়েছে। কিন্তু মেসে আর ফেরে নাই।'

বাদল কথাটা বলে কেন যেন চুপ মেরে যায়। রাবেয়া কথা বলে না। আলতো হাতে হারিকেনের আলোটা কমিয়ে দেয়। আবছা অন্ধকারে অনেকগুলো ছায়া কাঁপতে থাকে দেয়াল জুড়ে। নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে রাবেয়া যেন হঠাৎ কোথায় ডুবে যায়। দমকা হাওয়ায় ঘরের খুঁটিগুলো নড়ে ওঠে। প্রচন্ড শব্দে বাঁজ পড়ে কোথাও। রতন চুপচাপ বাদল মামার কোল থেকে নেমে গুটিশুটি মেরে রাবেয়ার বুকের মধ্যে ঢুকে যায়। বাইরে তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তুমুল বৃষ্টি।

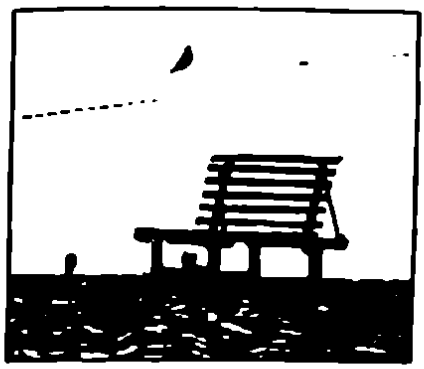

রাবেয়া চাচ্ছিল বাদল আর কটা দিন থাকুক। কিন্তু বাদলের অনেক কাজ। তাকে শরিয়তপুর গিয়ে স্কুলে জয়েন করতে হবে। তার আগে লজিং বাড়ি থেকে তল্পিতল্পা গোছাতে হবে। বাড়িটা ছাড়তে তার খানিকটা খারাপই লাগবে। প্রায় সাত বছর সে এই বাড়িতে থেকেছে। মানুষ অনেকটা গাছের মতো। সে কোথাও বেশি দিন থাকলে সেখানে তার শেকড় গজিয়ে যায়। এই শেকড় উপড়ানো সহজ ব্যাপার না। বাদল অবশ্য বিষয়টা পাত্তা না দেয়ার চেষ্টা করছে। জগতে মায়া বড় খারাপ জিনিস। সে এই মায়া নামক জালে বন্দি হতে চায় না। বিদায় লজিং বাড়ি।

বাদল বিরামপুরে ছিল আট দিন। এই আটদিনে সে দরকারি কিছু কাজ করেছে। রাবেয়ার ঘর ঠিক করেছে। যতটুকু সম্ভব বাজার-সদাই করে দিয়েছে। রতনের স্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের সাথে কথা বলেছে। সমস্যা হয়েছে রতনকে নিয়ে। সে বাদলের সাথে যাওয়ার বায়না ধরেছে। নানান ফন্দি-ফিকির করে তাকে থামাতে হয়েছে। বাড়িতে একটা পুরুষ মানুষ দরকার। সে এখন অনেক বড় হয়েছে। এই কথায় রতন কিছুটা খুশি। শেষ পর্যন্ত তাহলে তার বড় হওয়ার বিষয়টা সবার চোখে পড়েছে।

পাশের বাড়ির ফজলু নামের লোকটাকে বাদলের পছন্দ হয়েছে। এই লোকের সম্ভবত কোনো কাজ-কর্ম নেই। দশাসই শরীরের সহজ সরল মানুষ। মাঝে মাঝে মাটি কাটার কাজ করে। এর ওর ফুটফরমায়েশ খাটে। এছাড়া দিনভর খেয়াঘাটে বসে থাকে। বাদল নানান সময় ফজলুর সাথে গুটুর গুটুর করে গল্প করেছে।

'আপনার কোনো কাজ কর্ম নাই ফজলু ভাই?'

'কাজ কর্ম আছে, আবার নাই। যখন কাজ করতে ইচ্ছা হয় তখন আছে, আর যখন ইচ্ছা হয় না, তখন নাই।'

'আপনার পরিবারে কে কে আছে?'

'আমার পরিবারের বিষয়টাও ওইরকম। আছে, আবার নাই।'

'এইটা কেমন কথা ফজলু ভাই। ঘটনা খুলে বলেন।'

'ঘটনা খুইলা বলার কিছু নাই। আমার স্ত্রী চইলা গেছে। আমি নাকি মানুষ খারাপ। খারাপ মানুষের সাথে সে সংসার করবে না। এই জন্য চইলা গেছে। সাথে ছেলেরেও নিয়া গেছে। বাপের কাছে থাকলে ছেলেও খারাপ হবে।'

'আপনাকে সে খারাপ বলবে কেন? আপনি খারাপ কি করছেন?'

'সেইটার আমি কি জানি? যে খারাপ কাজ করে সে তো আর জানে না সে খারাপ কাজ করতেছে। জানে অন্য মানুষ।'

'আপনার স্ত্রী এখন কই আছে?'

'সে যার সাথে গেছে তার সাথেই আছে। শুনছি মাদারীপুর টাউনে আছে। নিজের স্ত্রী অন্য পোলার সাথে ভাইগা গেছে এই খবর তো আর জনে জনে বলা যায় না। খোঁজ-খবরও করা যায় না। এইজন্য খোঁজ-খবর করা বন্ধ করছি। তয় পোলাডার জন্য মাঝে-মইধ্যে খারাপ লাগে। তখন নদীর ঘাটে গিয়া বইসা থাকি। নদীর পানি দেখি। নদীর পানি মারাত্মক জিনিস। এরা মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝে। মানুষ বোঝে না।'

ঘটনা শুনে বাদল কিছুটা থতমত খেয়ে যায়। এই ঘটনা সে আশা করেনি। বিষয়টা নিয়ে তার কথা বলাই ঠিক হয়নি। প্রত্যেক মানুষের নিজের কিছু গল্প থাকে। সেই গল্পগুলো কেবল তার। তার একার।

বাদল লজিং বাড়ি এসে পৌঁছেছে মাগরিবের পর।

বাড়িতে খানাপিনা চলছে। উঠানজুড়ে শামিয়ানা টানানো। আজহার উদ্দিনের বিশাল বাড়ি। বাড়ির চারপাশ ঘিরে উঁচু দেয়াল। তিনি তার দুই স্ত্রী, এক কন্যা আর বিধবা বোনকে নিয়ে থাকেন দোতলা ভবনে। ভবনের তিনপাশে বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা। বাড়ির এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছোট ছোট টিনের ঘর। আজহার উদ্দিনের কাজে নানান লোকজনের দরকার হয়। এই ঘরগুলো তাদের জন্য। বাড়িতে ঢোকার গেটের মুখে একতলা পাকা বৈঠকখানা। দক্ষিণ দিকের বাগানের পাশে লম্বা একসারি ছোট ছোট ঘর। এই ঘরগুলো অতিথিদের জন্য। এই অতিথি ঘরের এক রুমেই বাদল থাকে।

বাদল রুমে ঢুকে জানালা খুলে দেয়। রুমজুড়ে ভ্যাপসা গরম। সুইচ টিপে বাতি জালাতেই ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সে।

'তুমি এইখানে?'

লাবণী দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। সে টুক করে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

'ভয় পেয়েছেন? ভয়ের কিছু নাই।'

'লাবণী, বাড়িভর্তি লোক। কেউ দেখলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে।'

'দরজা তো বন্ধ। কেউ দেখবে কিভাবে?'

এই মেয়ের সাথে কথা বলার কোনো অর্থ হয় না। যা হবার হবে। বাদল কাল সকালে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এই মেয়েকে বোঝা তার সাধ্য না।

'আপনি এতদিন থাকলেন কি মনে করে। কি ভেবেছিলেন? এসে দেখবেন আপদ বিদায় হয়েছে?'

'তুমি আমার কাছে আপদ কেন হবে লাবণী?'

'আশ্চর্য। হতদরিদ্র এতিম লজিং মাস্টারের প্রেমে যদি ছাত্রী হাবুডুবু খায় তখন তো আপদ মনে হওয়ারই কথা।'

'তুমি কখনো আমার প্রেমে হাবুডুবু খাও নাই লাবণী।'

'এটা অবশ্য ঠিক বলেছেন। মেয়েরা দুই ধরনের ছেলেদের প্রেমে হাবুডুবু খায়। এক, অতি গাধা। দুই, অতি বুদ্ধিমান। আপনি এই দুইটার কোনোটাই না। আপনি হচ্ছেন মাঝামাঝি টাইপ। এই মাঝামাঝি টাইপের স্বভাব হচ্ছে ব্যাঙের স্বভাব। এদের চারপাশে থাকে থই থই পানি কিন্তু পানিতে এরা বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। এরা পানিতে ভেসে থাকা শক্ত ডালপালা খোঁজে। এদের ক্ষমতা ছোট ছোট লাফ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা লাফ দেওয়ার সুযোগ খোঁজে। সুযোগ পেলেই ছোট্ট লাফে এক ডাল থেকে আরেক ডালে যায়। আপনি লাফ দেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এখন টুক করে লাফ দিবেন। আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়ার কিছু নাই। আপনি হাবুডুব খাওয়ার মতো কোন রসগোল্লা না।'

'তোমার কি কোনো কারণে মেজাজ খারাপ?'

'কেন? আপনার কি ধারণা আমার মেজাজ ভালো থাকলে আমি আপনার সাথে লুতুপুতু টাইপ কথা বলি?'

বাদল এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে আলনা থেকে তার ভাঙাচোড়া হ্যাঙ্গারগুলো নামিয়ে গোছায়। তার শার্ট প্যান্টগুলো ভাঁজ করে ব্যাগে ভরে। গামছাখানা বহু ব্যবহারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দু'চারটা ফুটোও উঁকি দিচ্ছে এখানে সেখানে। ব্যাগে ভরবে না ভরবে না করেও গামছাখানা ব্যাগে ঢোকায় বাদল। মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের কভারগুলো খুলে ভাঁজ করে। একটা রাত এখানে কোনোভাবে কাটিয়ে দেয়া যাবে। কাল খুব ভোরে

উঠেই রওনা দিতে হবে। তখন এসব গোছানো যাবে না। সবকিছু এখন গুছিয়ে রাখাই ভালো। অজপাড়াগায়ের স্কুলে বেতন কবে পাওয়া যাবে তার ঠিক ঠিকানা নাই। তার চেয়ে যতটুকু সম্ভব পুরনো জিনিস নিয়ে যাওয়াই ভালো।

'লাফ দেয়ার প্রস্তুতি তো দেখি ভালোই। আপনি এক কাজ করেন তাবলিগ জামাতে ঢুকে যান। লাফালাফির সুবিধা হবে। এক মসজিদ থেকে টুক করে আরেক মসজিদ। জীবন চলে যাবে লাফাতে লাফাতে। মাঝখান থেকে সওয়াব কামাই হবে।'

'তোমার মায়ের শরীর এখন কেমন?'

'আম্মার শরীর ভালো। সে তার সতীনরে নিয়ে আনন্দ ফূর্তি করছে। কন্যাবয়সী সতীনভাগ্য কয়জনের হয়? এই আনন্দে সে নাচছে। নাচের নাম ভোজপুরি নাচ। ভাবছি আব্বাকে নাচ দেখতে ডাকবো। কিন্তু সাহসের অভাবে পারছি না।'

'তোমার সাহসের অভাব আছে বলে তো মনে হয় না।'

'শুধু সাহস থাকলেই হয় না। বুদ্ধিও থাকতে হয়। আমার বুদ্ধি কম। এই জন্য সাহস দেখাতে পারছি না। তবে শীঘ্রই দেখাবো। সাহস দেখে আমার আব্বাজান হা করে বসে থাকবেন। সেই হা আর বন্ধ হবে না।'

'তুমি তোমার বাবার বিয়েটা ঠিক মতো নিতে পারো নাই লাবণী। তিনি কেন বিয়ে করেছেন, সেই ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন।'

'এই বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই না। আপনার তো দেখি নুন খাই যার, গুণ গাই তার অবস্থা। এইটা অবশ্য ভালো। আজকাল কৃতজ্ঞ লোকের বড় অভাব। আপনি যাবেন কখন?'

'কাল ভোরে।'

'একটা কথা বলি শোনেন। আপনার ধারণা ঠিক। আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাই নাই। সুন্দরী মেয়েদের অভ্যাস হলো তার চারপাশের হাবাগোবা ছেলেদের নিয়ে খেলা করা। এই খেলায় তারা আনন্দ পায়। আমিও আনন্দ পেয়েছি। আনন্দ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

'তোমার কি কিছু হয়েছে?'

'আমার কি হবে? আমার কিছু হয় নাই। আপনাকে একটা কথা বলি। আপনি আর এই বাড়িতে আসবেন না।'

লাবণী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাদল কি বলবে বুঝতে পারে না। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ লাবণী আবার ঘরে ঢোকে। তার হাতে একটা ব্যাগ। সে ব্যাগটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে যায়। হতভম্ব বাদল ব্যাগটা

খোলে। ব্যাগের ভেতর একটা নতুন মশারি, বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কতগুলো শার্ট, দু'খানা গামছা, সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট। একজোড়া স্যান্ডেল। একটা খাম। বাদল খামটা খোলে। খামের ভেতর কতগুলো একশ টাকার নোট। একটা ছোট্ট চিঠি। সেখানে গোটাগোটা হাতে লেখা:

'আপনাকে ছুঁয়ে দেখার তীব্র ইচ্ছা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপনার সামনে বসে থাকতাম! কিন্তু কখনো সাহস হতো না। আপনি ভাবছেন মেয়েটা কি অসভ্য! আমি কিন্তু কেবল শরীরের ছোঁয়ার কথা বলিনি। আমি জানি আমি আপনাকে কখনো কোনোভাবেই ছুঁতে পারিনি। না শরীরে, না মনে। আজ হঠাৎ মনে হলো, ছোঁয়াছুয়ির বিষয়টা থাকে কানামাছি খেলায়। জীবনটা তো কানামাছি খেলাই। কে কখন কিভাবে ছুঁয়ে যায় কে জানে!'

বাদল উঠেছে অন্নপূর্ণা হাইস্কুলের হেডমাস্টার মোফাজ্জল হোসেনের বাড়িতে। মূল ঘর থেকে বাদলের ঘর খানিকটা দূরে। বারান্দাসহ একরুমের ছোট্ট টিনের ঘর। ঘরের সামনে চাপকল। বাথরুমটা একটু দূরে। মাটির চুলায় রান্না করতে হয়। বাদল নিজেই রান্না করে। এতে অবশ্য বাদলের অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। সে থাকার এই ব্যবস্থা পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত। বাড়িভর্তি সুপারি গাছ। বাদল খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কলতলায় দাঁত মাজতে বসে। চারদিকের সবুজ ঘাসে তখন টেবিল টেনিসের হলুদ বলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে চকচকে সুপারি।

মোফাজ্জল হোসেন সজ্জন মানুষ। তিনি হঠাৎ হঠাৎ বাদলের ঘরের সামনে চলে আসেন। খোঁজখবর নেন।

'বাদল, তোমার থাকতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?'

'না না। এতো ভালো থাকার ব্যবস্থা পাবো সেটা আমি ভাবি নাই।'

'কোনো অসুবিধা হলে বলবা। লজ্জা করবা না।'

'জ্বি বলবো।'

'তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা আমার ঘরেই করার ইচ্ছা ছিল। একটা সমস্যার জন্য সম্ভব হয় নাই।'

'এখানে আমার কোনো সমস্যা নাই স্যার। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'চিন্তা এমন এক জিনিস চাইলেই বন্ধ করা যায় না। চিন্তা হচ্ছে রেলগাড়ির মতো, ইঞ্জিন বন্ধ করলেও রেলগাড়ি চলতেই থাকে। স্কুল কেমন লাগতেছে তোমার?'

'এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারি নাই। একটু সময় লাগবে। এমনিতে ভালোই।'

'শোনো, জীবনে প্রথম চাকরি, চোখ-কান খোলা রাখবা। স্কুলভর্তি পলিটিক্স। আমাদের বাঙালির এক স্বভাব, সবকিছুতে পলিটিক্স। দুইশ বছর বৃটিশ শাসনে থাকার ফল। আমাদের রক্তে তাদের পলিটিক্সটা ঢুকে গেছে, কিন্তু ইউনিটি-টা ঢোকে নাই। আমরা মানুষের খারাপ জিনিস গ্রহণ করতে ওস্তাদ। ভালোর ধারে কাছে নাই।'

বাদল বুঝতে পারে না, এই ধরনের আলোচনায় তার ভূমিকা কি হওয়া উচিত। সে চুপ করে থাকে। কথা কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করে। সুযোগ মতো আলোচনায় ঢুকে পড়তে হবে। আলোচনায় ঢোকাটা জরুরি। নতুন শিক্ষকদের নানান ছুঁতায় নিজের জ্ঞান গরিমার পরিচয় দিতে হয়।

'বৃটিশরা পলিটিক্স করতো অন্যরে বাঁশ দিতে। আর আমরা পলিটিক্স করি নিজেদের বাঁশ দিতে। স্কুলে বশির মাস্টার নামে একজন আছে। এক ব্যাটারি। এক ব্যাটারি মানে বুঝছো তো? এক ব্যাটারি মানে হইছে এক চোখ কানা। এই এক ব্যাটারির কাজ হচ্ছে স্কুলের সবার পিছনে বাঁশ দেওয়া।'

'জ্বী, ওনাকে চিনি। বশির স্যারের সাথে একদিন কথা হয়েছে।'

'এর কাছ থেকে সাবধানে থাকবা। বেশি মাখামাখির দরকার নাই। এক ব্যাটারি ব্রেনওয়াশে ওস্তাদ। স্কুল কমিটির সভাপতি পর্যন্ত এখন তার কথায় ওঠে-বসে। তোমাকে আমার বাড়িতে ওঠানো নিয়াও সে নানান কথা ছড়াইতেছে। এইটা নিয়াও সাবধান থাকবা।'

'কি কথা?'

'তোমাকে আমার বাড়িতে উঠাইয়া আমি নাকি শক্তি বাড়াইতেছি। এইসব আর কি!'

'স্কুল তো শক্তি দেখানোর জায়গা না।'

'এইটা ঠিক বললা না। দুনিয়ার সকল জায়গাই শক্তি দেখানোর জায়গা। শক্তি নানান রকমের হয়। একেক জায়গার শক্তি একেক রকমের।'

'তা অবশ্য ঠিক। আপনার বাড়িটা খুব সুন্দর স্যার। এত সুন্দর বাড়ি আমি আগে দেখি নাই।'

'বাড়ির আসল সৌন্দর্যই তো তুমি দেখো নাই। এই বাড়ির আসল সৌন্দর্য হইলো এই বাড়ির পুষ্কুনি। বাড়ির মেয়েছেলেরা পুষ্কুনিতে গোসল করে, কাজকর্ম করে। এই জন্য অবশ্য ব্যাটা ছেলেদের সেইখানে যাওয়ার

বিষয় বিধি-নিষেধ আছে। তবে খুব ভোরে আর বিকালের দিকে যাইতে পারো। তখন ফাঁকাই থাকে। আমাদের ঘরের উত্তরপাশে বিরাট পুকুর।'

'জ্বি আচ্ছা। সময় করে একদিন দেখবো।'

বাদল পুকুরের বিষয় কোনো আগ্রহ বোধ করলো না। এই বাড়ির কোনো বিষয়েই অবশ্য সে আগ্রহ দেখায় না। বাড়িতে কে আছে। কি আশায়-বিষয়। কোনো বিষয়েই না। কি দরকার? তার সকল আগ্রহ এখন স্কুল নিয়ে। সে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত স্কুলে কাটায়। স্কুল শেষে সোজা চলে যায় নদীর পাড়ে। নদীতে উত্তাল ঢেউ। বাদল চুপচাপ বসে থাকে। ঢেউ দেখে। তার হঠাৎ ফজলুর কথা মনে পড়ে। ফজলু ঠিকই বলেছে। 'নদীর পানি মারাত্মক জিনিস। এরা দুঃখ কষ্ট বোঝে। মানুষ বোঝে না।'

বাদলের আবার দুঃখ-কষ্ট কি! এই প্রশ্ন বাদল নিজেকেও করে। আসলেই তো, তার আবার দুঃখ কি! দুঃখ থাকে তাদের, যাদের জীবনের কাছে অনেক চাওয়া। তার কোনো চাওয়া নেই। যা পেয়েছে, সে তাতেই খুশি। কিন্তু মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। এরা দুঃখ ভালোবাসে। দুঃখ ছাড়া এদের জীবন অর্থহীন। যাদের জীবনে কোনো অপ্রাপ্তি নেই তারাও কারণে অকারণে দুঃখ পেতে চায়। দুঃখ ছাড়া জীবন বিস্বাদ ও বিবর্ণ।

আজ স্কুলে গিয়ে বাদলকে হঠাৎ ক্লাস টেন এর একটা প্রক্সি ক্লাশ নিতে হয়েছে। সেই ক্লাসে ঢুকেই বাদল চমকে গেল। দক্ষিণ দিকের জানালার পাশে যে মেয়েটা ঘাড় কাত করে খানিকটা বায়ে ঘুরে বসে আছে, সে দেখতে অবিকল লাবণীর মতো। বাদলের বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাৎ করে উঠলো! মেয়েটা ঘুরে সোজা হয়ে বসতেই অবশ্য বাদলের ভুল ভাঙলো। এখন আর মেয়েটির সাথে লাবণীর কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না সে। কিন্তু বাদল আর ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারলো না। তার মাথায় গেঁথে গেল লাবণী। স্কুল শেষে সোজা নদীর দিকটায় চলে এলো বাদল। নদীতে উত্তাল ঢেউ। খানিক পরপর পার ভাঙছে। সেই পার ভাঙা উত্তাল ঢেউ দেখতে দেখতে বাদলের হঠাৎ মনে হলো, তার জীবনে কোনো চাওয়া নেই, এই কথা সত্যি না। তার জীবনেও চাওয়া আছে। একটা বিশেষ চাওয়া।

সেই চাওয়া পৃথিবীর আর সকল চাওয়ার চেয়ে গভীর। কান্নার মতো গভীর।

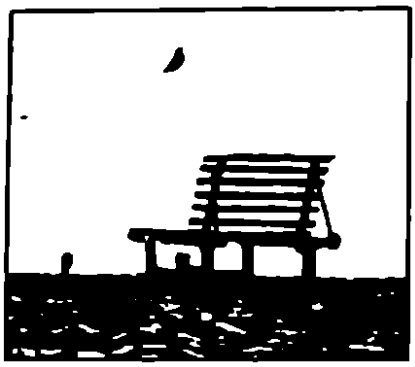

রতন দাঁড়িয়ে আছে লঞ্চঘাটে।

লঞ্চ এখনো আসেনি। তবে লঞ্চের ভেঁপুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দোতলা বিরাট লঞ্চ দেখে রতনের ভয় ভয় লাগে। কি বিকট শব্দে ভেঁপু বাজায়! তবু সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় লঞ্চঘাটে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কেন দাঁড়িয়ে থাকে তা শুধু সে-ই জানে। এই কথা সে কাউকে বলে না। মা-কে না, বু-কেও না। তবে আজ মনে হচ্ছে তার বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে। তার সাথে এসেছে কালু। কালু রতনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লঞ্চের নাম এমভি রাজধানী। এই লঞ্চ খুব ভোরে ঢাকা থেকে আসে। বিরামপুর ঘাটে দশ মিনিটের জন্য থামে। তারপর চলে যায় টরকী বন্দরে। টরকী বন্দরে সারাদিন থেকে সন্ধ্যা নাগাদ আবার ঢাকায় যাত্রা করে। যাওয়ার পথেও দশ মিনিটের জন্য থামে বিরামপুর। সারারাতের যাত্রায় পরদিন ভোরে গিয়ে পৌঁছে ঢাকায়।

দূরে নদীর বাঁকে লঞ্চের ধবধবে সাদা শরীর উঁকি দেয়। রতন একবার দেখে। তারপর আবার কালুর দিকে তাকায়। কালুর মুখে বিড়ি। সে গলগল করে মুখভর্তি ধোঁয়া ছাড়ে। লঞ্চটা দ্রুত কাছে চলে আসছে। রতন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। কালু রতনকে জিজ্ঞেস করে, 'কি করতে চাও তুমি? লঞ্চে ওঠতে চাও?'

রতন মাথা নাড়ে। না সে লঞ্চে উঠতে চায় না।

'তয় কি করতে চাও?'

'কিছু না। এমনেই লঞ্চ দেখবো। আব্বায় ঢাকার থেইকা এই লঞ্চেই আইতো। বু আর আমি আইসা দাঁড়াই থাকতাম।'

'অখন তো সইন্ধ্যা। সইন্ধ্যা বেলা তো লঞ্চ ঢাকা থেইকা আসে না। আসে বন্দর থেইকা।'

'জানি। ঢাকা থেইকা আসে বেয়ান বেলা। তখন তো আম্মায় আমারে আসতে দেয় না।'

'এইখানে আইসা কি করবা তুমি?'

এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব দেয় না রতন। সে উঁকি মেরে দেখে লঞ্চ কতটুকু আসলো। প্রায় কাছে চলে এসেছে। লঞ্চটা বিকট শব্দে ভেঁপু বাজায়। রতন দু'হাতে কান চেপে ধরে। লঞ্চ ঘাটে ভিড়তেই রতন ছুটতে শুরু করে। তার ছোট্ট শরীরটা নিমেষে যাত্রীদের ভীড়ে মিশে যায়। কালু কি করবে বুঝতে পারে না। সেও রতনের পিছু পিছু ছোটে। কিন্তু রতনকে কোথাও দেখা যায় না। লঞ্চে উঠতে যাত্রীদের মধ্যে হুটোপুটি লেগে গেছে। লঞ্চের সামনের সুঁচালো অংশটা ঘাটের মাটি ভেদ করে ঢুকে গেছে। সেখানে রতনকে দেখা যায়। রতনের হাতে একখানা আস্ত চক। কালু রুদ্ধশ্বাসে ছোটে। রতন পায়ের নখের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে লঞ্চের গায়ে কিছু একটা লিখছে। কালু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রতনের পাশে দাঁড়ায়।

'কি করো দাদা ভাই? কি লিখতাছো?'

রতন কোনো জবাব দেয় না। লঞ্চের সামনের এই নিচের অংশটা নীল। সেই নীল রঙের উপর সাদা চকে কিছু একটা লিখেছে সে। রতন কোনো কথা বলে না। সে তাকিয়ে আছে এলোমেলো অক্ষরগুলোর দিকে। সন্ধ্যার আলো ক্রমশই ম্লান হতে থাকে। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায় পৃথিবী। বড় রহস্যময় সময়। সেই রহস্যময় সময়ে, সন্ধ্যার ম্লান আলোয়, রতনের অক্ষরগুলো ক্রমশই ঝাপসা হয়ে আসে, 'আব্বা, তুমি আসো না ক্যান?'

কালু চুপচাপ অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে পড়তে জানে না। তবু কেন যেন তার চোখ ভিজে আসে। বিকট শব্দে ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চটা ধিরে ধিরে ঘাট ছাড়ে। কালু রতনের পেছনে এসে দাঁড়ায়। দু'হাতে চেপে ধরে রতনের ছোট্ট কাঁধ। তার হঠাৎ অক্ষরগুলো পড়বার তীব্র ইচ্ছে হতে থাকে।

রাবেয়ার ঘুম ভেঙে গেছে।

রাত ক'টা সে বলতে পারবে না। ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। হঠাৎ ঘুম ভাঙার কারণ কি? রাবেয়া পাশ ফিরে রতনকে জড়িয়ে ধরে আবার শুয়ে পড়লো। তার চোখ প্রায় লেগে এসেছে। এই মুহূর্তে শব্দটা শুনলো সে। ঠক ঠক ঠক। তারপর কুউউউ... কুউউউ...। কোনো রাতজাগা পাখি হতে পারে। এটা নিয়ে অবশ্য চিন্তিত হবার কিছু নেই। গ্রাম এখনো শহরের মতো পক্ষিবিহীন হয়ে যায়নি। এখানে রাত-বিরাতে নানান পাখি ডাকে। শিয়াল হুক্কাহুয়া করে। কিন্তু রাবেয়ার কেন যেন ভয় হতে লাগলো। তীব্র ভয়: সে

পাশ ফিরে তাকালো। লতিফা বানু ঘুমাচ্ছেন। মৃদু নাক ডাকছেন। এই সময় শব্দটা আবার হলো। ঠক ঠক ঠক। কুউ... কুউ... কুউ...। এবার আরো একবার বেশি।

রাবেয়ার হঠাৎ মনে হলো এটা কোনো পশু পাখির ডাক না। এটা মানুষের গলা। সে রতনকে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলো। শব্দটা বাড়ছে। সে যেখানে শুয়েছে ঠিক সেখানে বেড়ার উল্টোপাশে। হঠাৎ বেড়াটা নড়ে উঠলো। প্রথমে মৃদু, তারপর জোড়ে।

'আম্মা, আম্মা। ওঠেন। ওঠেন।' রাবেয়া শ্বাশুড়ির হাত ধরে টানলো। লতিফা বানু ধড়ফড় করে উঠে বসলেন। তিনি ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, 'কি হইছে বউ?'

'বাইরে কে জানি বেড়া ধইরা ঝাঁকি দিতেছে।'

'কি কও বউ!'

'হ আম্মা। প্রথমে শুনলাম পক্ষির ডাক, তারপর দেখি বেড়া ঝাঁকায়।'

লতিফা বানু ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামেন। চৌকির নিচ থেকে তরকারি কোটার বটিটা বের করে উচু গলায় বলেন, 'কেডা ওইখানে? কেডা?'

কোনো জবাব আসে না। চারপাশে সুনসান নিরবতা। লাতিফা বানু আর রাবেয়া অনেকক্ষণ জেগে বসে থাকে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দ রাত।

'খোয়াব দেখছো মনে হয় বউ?'

'না আম্মা, আমি পষ্ট শুনছি।' কিন্তু রাবেয়া গলায় জোর পায় না খুব একটা। স্বপ্ন না তো! সারাদিন কত আজেবাজে দুশ্চিন্তা হয়। সেই থেকে স্বপ্ন। হতেও পারে। রাবেয়া আর কিছু বলে না। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। লতিফা বানু বিছানায় উঠতে উঠতে বলেন, 'এখন ঘুমাও বৌ'।

রাবেয়া জেগে থাকে। বাকি রাত তার আর ঘুম হয় না।

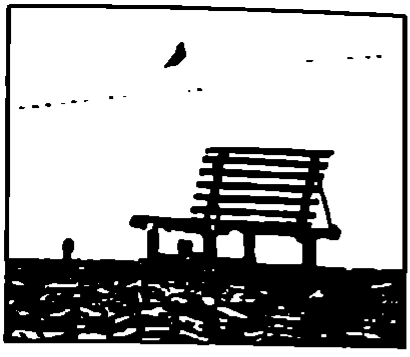

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তীব্র বৃষ্টি।

লাবণী বসে আছে বারান্দায়। তার পা রেলিঙের ফাঁক দিয়ে বাইরে। বৃষ্টি ভেজা নিজের পা দেখে লাবণী মুগ্ধ। তার মনে হচ্ছে পা আকৃতির এক জোড়া চাঁদ। এই চাঁদের সূর্যের কাছে কোনো ঋণ নেই। যত ঋণ বৃষ্টির কাছে।

নাসিমা বেগমের জ্বর। এই জ্বর দীর্ঘদিন থেকে। তিনি চাচ্ছেন লাবণী তার পাশে বসে থাকুক। মাথায় হাত বুলিয়ে দিক। কপালে জলপট্টি বেঁধে দিক। কিন্তু লাবণী সকাল থেকে বসে আছে বারান্দায়। সে কারো ডাকাডাকি শুনছে না। এখন বাজে দশটা। জ্বর থাকলেও এতক্ষণ নাসিমা বেগমের মাথা ব্যাথা ছিল না। এখন মনে হচ্ছে চিনচিন করে মাথা ব্যাথাও শুরু হয়েছে। এই চিনচিনে ব্যাথাটাকে তিনি ভয় পান। কিছুক্ষণের মধ্যে এই ব্যাথা ছড়িয়ে পড়বে সারা শরীরে। তার মনে হবে তিনি ব্যাথায় পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

লাবণী মায়ের পাশে বসলো। নাসিমা বেগম এটা আশা করেননি। তিনি ধারণা করেছিলেন বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত লাবণী বারান্দায়ই বসে থাকবে। তার মাথা ব্যাথা বাড়তে শুরু করেছে। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন ব্যাথাটাকে প্রশ্রয় না দিতে। দাঁতে দাঁত চেপে শুয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ব্যাথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তীব্র ব্যাথা। নাসিমা বেগমের চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি চোখে দেখবেন অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

লাবণী মায়ের মাথায় হাত রাখলো, 'ব্যাথা মা'?

নাসিমা বেগম জবাব দিলেন না। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। চোখ বন্ধ করে নানান বিষয়ে ভাবতে হবে। ভালো কিছু। আরামদায়ক কিছু। ব্যাথা ভুলে থাকার চেষ্টা। সবচেয়ে ভালো হয় বাবার কথা ভাবলে। তার শৈশবের পুরোটাই অসাধারণ সুখের স্মৃতি। তিনি চেষ্টা করছেন তাদের ফরিদপুরের বাড়ির কথা ভাবতে। চল্লিশ বছর আগের এক দৃশ্য। বাড়ির সামনে বাঁধানো পুকুরঘাট। ঘাটের দুই পাশে শিউলী ফুলের গাছ। বাবা খুব ভোরে তাকে ঘুম থেকে ডাকলেন। বাইরে প্রচণ্ড শীত। সে বাবার চাদরের ভেতর ঢুকে গেলেও

তার মধ্যে বের হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা মায়ের পেটের থলি থেকে মাথা বের করে আছে। হেমন্তের ঘন কুয়াশায় এক অবাক পৃথিবী। বাবা তাকে পুকুরঘাটে নিয়ে গেলেন। নাসিমার হঠাৎ মনে হলো পুকুরঘাট ভর্তি অসংখ্য তারা। থোকা থোকা তারা। ঘাটভর্তি শিউলী ফুলগুলোকে লাগছে তারার মতো। সে বাবার বুকের মধ্যে ঢুকে আছে। বাবা একটা একটা করে তারা তুলে তার হাতে দিচ্ছে। তারাদের গায়ে ফোঁটাফোঁটা শিশির। সেই শিশির কনকনে ঠাণ্ডা। কিন্তু বাবার বুকের ভেতর কি আরামদায়ক ওম! তার হাতভর্তি শিউলীফুল। সে বাবার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

নাসিমা বেগম প্রবল ব্যথা উপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়লেন

নাসিমা বেগমের ঘুম ভাঙলো বিকেলে। তিনি মারা গেলেন সন্ধ্যায়। লাবণী মায়ের হাত ধরে বসে ছিল। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাসিমা বেগম ছিলেন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার মনে হচ্ছিল, তিনি পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছেন। চাইলেই এখন ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে হাঁটতে পারবেন। লাবণীর মাথায় তেল দিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি সেসবের কিছুই করলেন না। তিনি যেটা করলেন সেটা হলো জোহরাকে ডেকে পাঠালেন। জোহরার সাথে সময় নিয়ে কথা বললেন।

'কেমন আছো?'

'জ্বী, ভালো।'

'লাবণীরে আমি যেমন মা বইলা ডাকি, আমার ইচ্ছা করছিল তোমারেও তেমনি মা বইলা ডাকতে। বলতে ইচ্ছা করছিল, মা জোহরা কেমন আছো। কিন্তু তুমি হইছো আমার সতীন। সতীনরে মা বইলা ডাকা যায় না।'

জোহরা কথা বলল না। সে তাকিয়ে আছে নাসিমা বানুর চোখের দিকে।

'গত নয় মাসে অনেকবার ভাবছি তোমার সাথে কথা বলবো। কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। তুমি আবার ভাইবো না তোমারে আমি ভয় পাই। বিষয় তা না। বিষয় অন্য। আমি ভয় পাই নিজেরে। তোমার চেহারা দেখার পর নিজেরে কিভাবে সামলাবো এইটা নিয়া আমার ভয় ছিল। ভয় কেন ছিল জানো?'

'জানি।'

'না, জানো না। এই ভয়টা তুমি বুঝবা না। বুঝবে সে, যার স্বামী আরেকটা বিয়া করছে। সেই বিয়া করছে শরীরের জন্য। একটা কথা কি

জানো? স্বামী রক্ষিতা নিয়া থাকে, বেশ্যাপাড়ায় যায় সেইটাও মাইনা নেওয়া যায়। কিন্তু আরেকটা বিয়া করবে এইটা মাইনা নেওয়া যায় না। মেয়ে মানুষ সব কিছু ভাগ করতে পারে কিন্তু নিজের স্বামীরে ভাগ করতে পারে না।'

জোহরা নাসিমা বেগমের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। সে খুব মনোযোগ দিয়ে তার পায়ের নখ দেখতে থাকে। নখের নেলপলিশ উঠে গেছে।

'তোমারে আমি কি ডাকবো, এইটা নিয়াও আমার চিন্তা ছিল। এক সতীন আরেক সতীনরে কি ডাকে সেইটা নিয়া আমি ভাবছি। তাদের সম্পর্ক হয় বইনের সম্পর্ক। তারা একজন আরেকজনরে ডাকে বইন। সমস্যা হচ্ছে, তুমি হইতেছো আমার মাইয়ার বয়সি। তোমারে আমি বইন ডাকবো কেমনে!'

নাসিমা বেগম পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে খাটে হেলান দেন।

'আমার কোনো বইন ছিল না। আমার ছিল পাঁচ ভাই। বইন ছিলাম আমি একলা। সবার ছোট। পাঁচ ভাইয়ের এক ছোট বইন। বুঝতে পারতেছো, কেমন আদরের ছিলাম আমি? একটা ঘটনা বলি, আমার বয়স তখন বারো কি তেরো। ভোর রাতের দিকে জ্বর উঠছে। সেই জ্বর দুপুর পর্যন্ত বাইড়া গেল। মুখ দিয়া ফেনা বাইর হইতেছে। আবোল তাবোল বকতেছি। আমার দুই ভাই তখন থাকে ঢাকায়। এক ভাই চিটাগং। তারা খবর কেমনে পাইছে কে জানে! পরদিন রাইতদুপুরে সবাই বাড়িতে আইসা হাজির। আমার জ্বর ছিল সাত দিন। এই সাত দিন আমার পাঁচ ভাই বইসা আছে আমার বিছনার কাছে। দৃশ্যটা চিন্তা করো। চিকনা-পাতলা একটা মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার বিছনার চারপাশে বিরাট বিরাট পাঁচটা ভাই দিন-রাইত বসা। আটদিনের দিন রাইত একটায় আমি ঘুম থেইকা উইঠা বললাম, খিদা লাগছে, ভাত খাব। পুষ্কুনির রুই মাছের মাথা দিয়া ভাত খাব। মাঘ মাসের রাইত। বরফের মতোন ঠাণ্ডা পড়তেছে। এত রাইতে মাছ ধরার লোক পাইবো কই? দুইজন পাওয়া গেল। তারা এত রাইতে পুষ্কুনিতে নামবো না। আমাগো পুষ্কুনিতে নাকি জ্বীনের আছর আছে। সেই ঠাণ্ডা রাইতে আমার পাঁচ ভাই জাল নিয়া নাইমা গেল। বিরাট পুষ্কুনি। এরা কখনো পুষ্কুনিতে নামে নাই। জাল দিয়া কখনো মাছ ধরে নাই। ছোট ছোট মাছ ধরা পড়তে লাগলো জালে। তারা সেই মাছ রাখে না, ছাইড়া দেয়। বইনে মাছ খাইতে চাইছে, মাছ লাগবো বড়। ফজরের আজানের একটু আগে মাছ ধরা পড়লো। নয় কেজি ওজনের বিশাল রুই। আমার পাঁচ ভাই তখন ঠাণ্ডায় বরফ। এরা ঠকঠক কইরা কাঁপতেছে। উঠানের মাঝখানে চুলা পাতা

হইলো সেই চুলার আগুনের চারপাশে আমার ভাইয়েরা বইসা ঠকঠক কইরা কাপতেছে চুলায় রান্না হইতেছে রুইমাছ। বইনে খাইবো।'

নাসিমা বেগম একটু থামলেন। তার চোখভর্তি জল। তিনি জল লুকানোর চেষ্টা করলেন না। শাড়ির আঁচলে সময় নিয়ে চোখের জল মুছলেন। জোহরা তাকিয়ে আছে বাইরে। জানালার বাইরে আজহার উদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে। সাথে এমপি আশফাক সাহেব। সম্ভবতঃ নির্বাচন নিয়ে কোনো আলাপ চলছে।

'সেই বইন হইছি আমি। পাঁচ ভাইয়ের বইন। সেই আমি কি করলাম জানো? আজহার উদ্দিনের সাথে ভাইগা আসলাম। সে পড়তো আমার মেঝো ভাইয়ের সাথে। আমার বাপ-মা'র কাছে সে ছিল আরেকটা ছেলের মতোন। সে আমাদের বাড়িতে যাইতো, থাকতো। কিন্তু তার সাথে আমার সম্পর্ক কেউ মানতে পারে নাই। যখন জানলো, তখন আব্বা আমারে ডাইকা বলল, মা-রে, এই ছেলের সাথে আমি তোমার বিয়া দিবো না। তোমার বিয়া ঠিক করা আছে। আমি তোমার বিয়া নিয়া কথা দিয়া ফালাইছি ডাক্তার সাবরে। তার ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তেছে। সে দেশে আসলেই তোমার সাথে বিয়া হবে। আমার কথার দাম আমার জীবনের চাইতেও বেশি। তোমার বিয়া তার সাথেই হবে। আমি আব্বারে কিছু বললাম না। আমি যেইটা করলাম সেইটা হচ্ছে কার্তিক মাসের এক বৃষ্টির রাইতে আজহার উদ্দিনের সাথে চইলা আসলাম।'

নাসিমা বেগমের আজ কান্নার দিন। তিনি অনেকদিন কাঁদেন না। যেদিন আজহার উদ্দিন কাঁচমাঁচু হয়ে, হাতজোড় করে, নানান যুক্তিতর্ক দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিলেন, তিনি বিয়ে করেছেন। সেই দিনও না। নাসিমা বেগম একটুও কাঁদেননি। কিন্তু আজ কাঁদছেন। আজ তার কান্নার দিন। তিনি কাঁদছেন।

'আমি এই বাড়িতে আসছি আইজ সাতাইশ বছর। এই সাতাইশ বছরে আমি সেই মুখগুলা আর দেখি নাই। আর কোনো দিন দেখবোও না।'

জোহরা নাসিমা বেগমের হাত ধরলো। শক্ত করে চেপে ধরলো। নাসিমা বেগমের শরীর থরথর করে কাঁপছে।

জোহরা চলে যাওয়ার পর নাসিমা বেগম ডাকলেন আজহার উদ্দিনকে। বাড়িভর্তি নানান লোকজন। আজহার উদ্দিনের তুমুল ব্যস্ততা। কিন্তু তিনি সবকিছু রেখে শান্ত মুখে ঘরে ঢুকলেন। নাসিমা বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছো?'

আজহার উদ্দিনের প্রশ্নের জবাব দিলেন না নাসিমা বেগম। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বসো'।

আজহার উদ্দিন নাসিমা বেগমের পাশের চেয়ারে বসলেন। নাসিমা বেগম জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ইলেকশনের কাজ কর্ম কেমন চলতেছে?'

'চলতেছে। দেশের অবস্থা ভালো না। ঢাকায় ছাত্ররা গণ্ডগোল করতেছে। এটা সামলাতেই তো সরকার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।'

'তাতে তোমার তো অসুবিধা হওয়ার কথা না। এখন যারা আছে তারাও তো তোমারই লোক।'

'সময় পাল্টাচ্ছে নাসিমা। আগের অনেক হিসাবই মিলছে না।'

'সব হিসাব মেলার কথাও না। হিসাব বড় কঠিন জিনিস। তোমার নতুন বউয়ের খবর বলো?'

'তুমি কি এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাকে ডাকছো? এই বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না।'

'কেন, লজ্জা পাও? লজ্জা কিসের? তুমি তো ধর্মমতেই বিয়া করছো। তোমার বউ পালার ক্ষমতা আছে। সমস্যা কি? লজ্জার কিছু নাই। তুমি অপরাধ কিছু করো নাই। অপরাধ করলে লজ্জা পাওয়ার বিষয় ছিল।'

আজহার উদ্দিন খপ করে নাসিমা বেগমের হাত ধরলেন, 'নাসিমা, আমি অনেক চেষ্টা করছি, শেষ পর্যন্ত না পারতে...। তোমার সামনে দাঁড়ানোর মুখ আমার নাই নাসিমা। আমাকে তুমি মাফ করে দাও নাসিমা।'

'তুমি তো কোনো অপরাধ করো নাই। করলেও আমি তোমারে মাফ কইরা দিছি। যে তোমারে মাফ করে নাই তার কাছে মাফ চাও।'

'তুমি কার কথা বলতেছো নাসিমা?'

'তুমি ভালো কইরাই জানো আমি কার কথা বলতেছি।'

আজহার উদ্দিন এই কথার কোনো জবাব দিলেন না। নাসিমা আবার বলল, 'ঘটনা আমি আগেই আবছা. শুনছি। এইটা দোষের কিছু না। ক্ষমতাবান মানুষেরা এইরকম একটু আধটু কইরাই থাকে। ক্ষমতা লুকাই রাখার জিনিস না। এইটা প্রকাশ করতে হয়। আগের দিনের রাজা-বাদশাহ-জমিদাররাও এই কাজ করছে। কোনো মেয়ে পছন্দ হইছে, নানান ছল-চুতায় সেই মেয়েরে তুইলা আনছে। তারা শুধু ভোগ করতো। দাসী-বান্দি হিসেবে। কোনো স্বীকৃতি ছিল না। তুমি তো খারাপ কিছু করো নাই। শরিয়ত মতে বিয়া কইরা স্বীকৃতি দিছো।'

'বিষয়টা তুমি ভুল জানছো। বন্দরে জোহরার বাপের পাটের আড়ত ছিল। বছর বছর পাটের আড়তে লোকসান দিতেছিল সে। কিন্তু বাপ দাদার

ব্যবসা সে ছাড়বে না। প্রত্যেক বছর কড়া সুদে ঋণ নিছে অনেকের কাছ থেকে। সবচেয়ে বেশি নিছে সুবল বণিকের থেকে। সেই ঋণ শোধ তো করতেই পারে নাই। উল্টা এইবার পাটের গুদামে আগুন লেগে পথে বসছে। জোহরার সাথে যেই ছেলের বিয়ে ঠিক ছিল। সেই ছেলে বিয়ের দিন তিনেক আগে হঠাৎ বলছে এই বিয়ে সে করবে না।'

'তারপর তুমি গিয়া জোহরারের বিয়া কইরা তার বাপের ঋণ শোধ করলা, তাই তো?'

আজহার উদ্দিন এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন নাসিমা বেগমের দিকে। নাসিমা বেগমের মুখ শান্ত। নিশ্চিন্ত। তিনি বললেন, 'জোহরার বাপের ঋণ শোধ করার জন্য জোহরাকে বিয়া করা লাগে না। কোনো বাপ-ই নিজের ইচ্ছায় নিজের বয়সি কারো কাছে মেয়ে বিয়া দেয় না। জোহরার বাপ আমারে সব বলছে। সে আইসা আমার পা ধইরা মাফ চাইয়া গেছে। ঘটনা আমি জানি। তোমার ইঙ্কনে ঘটনা ঘটাইছে আলতাফ ঘটক। তুমি তারে আগেই বলছিলা মেয়ে দেখতে। অল্প বয়সি মেয়ে। সে যেন খোঁজ-খবর রাখে। কিন্তু যত গরীবই হোক, না খাইয়া থাকুক, তাও কোনো বাপ-মা তোমার বয়সি কারো কাছে মেয়ে বিয়া দিতে চায় না। আলতাফ ঘটক গিয়া জোহরার বাপেরে বলল, তার টাকা তুমি শোধ করবা, কিন্তু শর্ত আছে। সেই শর্ত হইলো জোহরার সাথে তোমার বিয়া। জোহরার বাপ রাজি হয় নাই। তখন সুবল বণিকসহ যাদের কাছে তার ঋণ জমছিল তাদের দিয়া ঋণশোধের জন্য চাপ দেওয়াইছো তুমি। তখন তার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু জোহরা চায় নাই তার বাপ আত্মহত্যা করুক। সে বাপের জন্য নিজেরে কোরবানী দিলো।'

এই পর্যন্ত বলে থামলেন নাসিমা বেগম। তার পানির পিপাসা পেয়েছে। তিনি নিজেই জগ থেকে ঢেলে পানি খেলেন। আজহার উদ্দিন মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছেন। নাসিমা বেগম তাকিয়ে আছেন আজহার উদ্দিনের মাথার দিকে। মাথার মাঝখানটায় চুল উঠে গিয়ে টাক জেগে উঠছে। মানুষটারে কতদিন কাছ থেকে দেখা হয় না। কথা হয় না। আজহার উদ্দিন অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নাসিমা বেগম সেই সুযোগ তাকে দেননি। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখে লেগে থাকা পানি মুছতে মুছতে নাসিমা বেগম বললেন, 'তোমারে একটা কথা বলি। তুমি হয়তো ভাবছো সব ঠিক হয়ে গেছে। সহজ সমাধান হয়েছে। ঘটনা তা না। কোনো মেয়েই এই অপমান ভুলতে পারে না। মেয়ে মানুষের জেদ বড় খারাপ জিনিস। কথায় আছে, পুরুষ মানুষের জেদে বাদশাহ, মেয়ে মানুষের জেদে বেশ্যা। আর বেশ্যা

মেয়ে মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নাই। এমনিতে জোহরা মেয়ে ভালো। কিন্তু এই অপমান সে কেমনে ভুলবে? মেয়ে মানুষ অপমান কোনোদিন ভোলে না।'

আজহার উদ্দিন কোনো কথা বললেন না : নাসিমা বেগম হঠাৎ আলতো করে আজহার উদ্দিনের হাত ধরলেন। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমার মাথায় একটু হাত রাখো। প্রথম যেদিন রাখছিলা, সেই দিনের মতো। হাত রাখো। একটু হাত রাখো।'

মা মারা যাওয়ার কোনো শোক লাবণীর ভেতর দেখা গেল না। সে চিৎকার করে কান্নাকাটি কিছু করেনি। বাড়ি ভর্তি লোক। লাবণী বসে আছে বাদলের ছোট্ট ঘরটায়। ঘরটা বাদল যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনই আছে। লাবণী জানালার গ্রীলের কাছে এসে দাঁড়ালো। তার পরনে কমলা রঙের শাড়ি। নাসিমা বেগম দুপুরে হঠাৎ তাকে ডেকে বললেন, 'মা রে, আলমারির নিচের তাকে আমার একটা শাড়ি আছে। কমলা রঙের শাড়ি। এই শাড়ি আমার বড় ভাইজান তার প্রথম রোজগারের টাকায় কিনে দিছিলো। তুই শাড়িটা একটু পড়। তোরে শাড়িটাতে খুব দেখতে ইচ্ছা করতেছে'।

লাবণী ভ্রু কুঁচকে বলেছিল, 'তুমি শুধু শুধু ঝামেলা করো। আমি এখন এইসব শাড়ি টাড়ি কিছু পড়তে পারবো না। শাড়ি জিনিসটা আমার অসহ্য লাগে। তারওপর রঙ হচ্ছে কমলা। এই রঙ আমার দুই চোখের বিষ। কমলা রঙ পড়লে মনে হয় আমি নিজেই আস্ত একটা কমলা। একটু পরেই কেউ আমাকে ছিলে খাওয়া শুরু করবে'।

নাসিমা বেগম কিছু বললেন না। মনে মনে হাসলেন। মেয়েটা হয়েছে ঠিক তার মতো। সব মেয়েই কোনো না কোনোভাবে মায়ের মতোই হয়। এই মেয়ে হয়েছে একটু বেশি। লাবণী সকালে একবার গোসল করেছে। সে দুপুরবেলা আবার গোসল করলো। গোসল করে আলমারীর নিচের তাক থেকে শাড়ি বের করে পড়লো। তারপর নাসিমা বেগমের সামনে গিয়ে বলল, 'পড়েছি তোমার কমলা শাড়ি। আমার নাম এখন কমলা বানু'।

নাসিমা বেগম বললেন, 'তোর নাম কমলাবানু না। তোর নাম হচ্ছে কমলাফুলি। তোকে নিয়ে একটা ছড়াও আছে। সেই ছড়ার প্রথম দুই লাইন হচ্ছে, কমলাফুলি কমলাফুলি কমলালেবুর ফুল, কমলাফুলির বিয়ে হবে কানে মোতির দুল। কিন্তু বিয়া নিয়া তুই যা শুরু করেছিস, তোর বিয়া আমার খাওয়া হবে বলে তো মনে হয় না'।

লাবণীর এখন মনে হচ্ছে নাসিমা বেগম বুঝতে পেরেছিলেন তিনি মারা যাচ্ছেন; তার নানা কর্মকাণ্ডে সেটা বোঝা গিয়েছিল। মা নেই এই বিষয়টা এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না লাবণীর। তার মনে হচ্ছে গত ক'মাস ধরে মা যেমন চুপচাপ ঘুমিয়ে কাটাতো তেমনি ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ হঠাৎ জেগে বলবে, 'দেখতো লাবণী, আমার কপালে হাত দিয়ে দেখতো জ্বরের কি অবস্থা?'

মসজিদ থেকে মুর্দার জন্য খাটিয়া এসেছে। মৃত্যু জিনিসটা কি অদ্ভুত! যেই মানুষটা নরম তোষক ছাড়া ঘুমাতে পারতো না। একদিনের বাসি বিছানার চাদর হলেও চেঁচিয়ে বলতো, 'বাসী চাদরে গা কুটকুট করে, ধোয়া চাদর আন। আজকের ধোয়া চাদর'। বালিশ নিয়েও ছিল নানান বায়না। খুব শক্ত হওয়া যাবে না, আবার তুলতুলে নরম হওয়াও যাবে না। সেই মানুষটা এখন চলে যাবে মাটির তলে। পোকা মাকড়ের খাবার হবে। তাকে আর ঘরে রাখা যাবে না। তার প্রিয় ফুলতোলা চাদরে ঢেকে রাখা যাবে না। মাথার চুলে তেল দেয়া যাবে না। শরীরে ডলে ডলে সুগন্ধি সাবান মাখা যাবে না; তার শরীর যাবে পঁচে। দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যাবে না! তাকে রেখে আসতে হবে ঘর থেকে দূরে, জংলা মতো কোনো জায়গায় মাটি খুঁড়ে তার নিচে।

কি আশ্চর্য! এতো আয়োজন, এতো উপকরণ তাহলে কিসের জন্য!

লাবণী মায়ের সাথে তার কোনো একটা বিশেষ স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, মায়ের মুখও তার মনে পড়ছে না। কষ্ট না, বিষয়টা নিয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। যেই মানুষটার সাথে সে অষ্টপ্রহর লেগে ছিল, সেই মানুষটার চেহারা মনে করতে পারবে না এটা কেমন কথা! লাবণীর যেটা মনে পড়ছে, সেটা হচ্ছে মায়ের পিঠ। মা চার মাসের জ্বরের পুরোটা সময় বলতে গেলে জানালার কাছে বসে ছিল। এই সময়টা লাবণী চুপচাপ মায়ের পেছনে বসে থাকতো। তার মনে হতো চোখের সামনে একটি চমৎকার ছবির দৃশ্য। ছবির অন্ধকার ফ্রেমের মাঝখানে একটি খোলা জানালা। সেই জানালার সামনে একজন ক্লান্ত বিধ্বস্ত রমণীর ছায়া মূর্তি। একটি বিষণ্ণ সুন্দর ছবি। লাবণীর এখন মায়ের সেই অন্ধকার পিঠের দৃশ্য মনে পড়ছে। দৃশ্যটা সে মাথা থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। বরং আরো গেঁথে যাচ্ছে। তার নিজের উপর প্রচণ্ড বিরক্ত লাগছে। লাবণীর হঠাৎ মনে হলো, সে একটা তীব্র ঘ্রাণ পাচ্ছে। ঘ্রাণের উৎস তার শরীর। ঠিক শরীর না, ঘ্রাণটা আসছে তার শাড়ি থেকে। এই ঘ্রাণ তার চেনা। অনেক দিনের চেনা। সে শুয়ে আছে নৌকার পাটাতনে। তার গা [illegible]। খালের পর খাল পুঁটিনসত্ত্বে ছেয়ে গেছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিলীপ ডাক্তারের কাছে। বিরাট কেরও বিরাট ডাক্তার। মাঝিরা

প্রাণপণে নৌকা বাইছে। এই নৌকায় ছই নাই। গনগনে সূর্যের তাপে পুড়ে যাচ্ছে সব। একটা নারীকণ্ঠ খানিক পর পর বিলাপ করছে, 'জোড়ে বাও, আরো জোড়ে। আরো জোড়ে। আল্লাহগো আমার মায়রে বাঁচাও। ও মা, মা রে। আর একটু, আর একটু মা'। তার ছোট্ট শরীরে সূর্যের তাপ লাগছে না, গুঁটি বসন্তের ব্যাথাও লাগছে না। কারণ তার ছোট শরীরটা ঢেকে আছে কমলা রঙের এক শাড়ির আঁচলে। সেই আঁচল তার মায়ের। মায়ের সেই আঁচলভর্তি ঘ্রাণ। ঘ্রাণভর্তি মমতা।

লাবণী শক্ত হাতে জানালার গ্রিল চেপে ধরলো। তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো, 'ও মা, মাগো।'

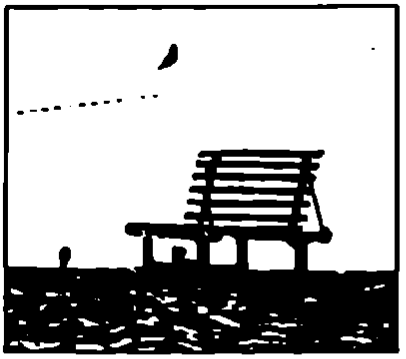

মৃত্যু বেশিরভাগ মানুষকেই মুছে ফেলে।

নাসিমা বেগমকেও মুছে ফেলল। তাকে মুছে ফেলল অনেকটা হুট করেই। অত্যন্ত দ্রুততায়। তার মৃত্যুর দিন পনের বাদেই সব কিছু যেন স্বাভাবিক হয়ে গেল। আজহার উদ্দিনের বাড়িভর্তি সারাদিন নানান লোকজন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অস্থির। স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে নানান ফন্দি ফিকির করছে। এই অস্থির সময়ে শক্ত করে হাল না ধরলে বিপদ। সিদ্ধান্ত নিতে হবে হিসেব কষে। আজহার উদ্দিনের ধারণা তিনি হিসেব কষেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তিনি জানেন, এখন তার নিজেরও কিছু বটবৃক্ষ দরকার। যেই বটবৃক্ষের নিচে তিনি প্রয়োজন হলে আশ্রয় নিতে পারবেন। এই জন্যই আশফাক সাহেবকে তিনি হাতে রাখছেন। প্রয়োজনে দরকার হতে পারে। তবে আশফাক সাহেব আজকাল আজহার উদ্দিনের কাছে ক্রমশই অস্পষ্ট হয়ে উঠছেন। তিনি কি নতুন কোনো খেলা খেলছেন? রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। এখানে বিশ্বাস বলতে কিছু নেই। আশফাক সাহেব কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এই মুহূর্তে আশফাক সাহেবকে আজহার উদ্দিনের দরকার। কিন্তু আশফাক সাহেবের বিভিন্ন আচার-আচরণ নিয়ে আজহার উদ্দিন খানিক চিন্তিত। স্থানীয় রাজনীতিতে আজহার উদ্দিনের যে প্রভাব, সেই প্রভাব কি আশফাক সাহেব ভেঙে দিতে চাইছেন? বিভিন্ন খবর আজহার উদ্দিনের কানে আসছে। কিন্তু সেটি তিনি আশফাক সাহেবকে বুঝতে দেন না। তিনি বরং যথেষ্ট বিনয়ী হয়েই থাকেন তার কাছে। যেন আশফাক সাহেবের উপরই তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আশফাক সাহেবের উপর তিনি রীতিমত বিরক্ত। আজকাল লোকটার আচরণে বাড়াবাড়ি রকমের ঔদ্ধত্য ফুটে উঠছে। বিষয়টাতে আঁতে ঘা লাগছে আজহার উদ্দিনের। তিনি কারো ঔদ্ধত্য পছন্দ করেন না। এমনকি সেটি লাবণীরও না। কিন্তু সমাধানটা কখন কিভাবে করতে হবে তা ভালোই জানা আছে আজহার উদ্দিনের।

আজহার উদ্দিন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ না। তিনি তার নিজস্ব পরিকল্পনা মতোই এগুচ্ছেন। সেই পরিকল্পনা আরো অনেক বড়। পরিকল্পনার কেন্দ্রে আছে লাবণী। তিনি লাবণীর বিয়ে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছেন। এবার পাত্র থাকে আমেরিকা। পাত্রের বাবা বর্তমান সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী। সম্বন্ধটা হয়ে গেলে আজহার উদ্দিন নিশ্চিন্ত। তার সব মনোযোগ এখন এই বিষয়ে। কিন্তু এই কথা তিনি এখনো কাউকে বলেন নি। আজহার উদ্দিন অবশ্য নিজের মনের কথা কাউকে বলেন ও না। কখনো কখনো নিজের কাছেও না। সমস্যা হচ্ছে লাবণীকে রাজী করানো। তবে আজহার উদ্দিনের বিশ্বাস, তিনি সেটা পারবেন। এই সুযোগটা তিনি হারাতে চান না। তার জীবনে কোনো সুযোগই তিনি হারাননি। আজহার উদ্দিন জানেন, সুযোগ বারবার আসে না।

আশফাক সাহেব বসে আছেন বৈঠকখানায়। তার পরনে ফুলতোলা হাফহাতা শার্ট। শার্ট তিনি নতুন পড়া ধরেছেন। গত দশ বছরে তিনি পাজামা পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছু পড়েননি। এখন ফুলতোলা হাফহাতা শার্ট পড়া আশফাক সাহেবকে দেখলে খট করে চোখে লাগে। আজহার উদ্দিন আশফাক সাহেবকে এই পোশাকে দেখে খানিকটা অবাক হয়েছেন। তারপরও মুখে হাসি টেনে বললেন, 'আপনার বয়স তো কমে গেছে'।

আশফাক সাহেব জবাবে মৃদু হাসলেন। কথা বললেন না। আজহার উদ্দিন আবার বললেন, 'তা সরকারের অবস্থা এখন কি বুঝছেন? শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে তো?' আশফাক সাহেব মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছিলেন। তিনি ধীরে সুস্থে লেখাটার শেষ ক'টি লাইন পড়ে শেষ করলেন। তারপর বললেন, 'এটা একটা কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর বোধহয় এই মুহূর্তে কেউ জানে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের খুব ক্রিটিক্যাল সময় এটা। সরকার তো চেষ্টা করবেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সব কিছুই সরকারের নিয়ন্ত্রণে নাই। তাছাড়া বাঙালি জাতি হিসেবে হুজুগে। এটাও একটা সমস্যা'।

আজহার উদ্দিন বললেন, 'কিন্তু সরকারবিরোধী আন্দোলন তো প্রতিদিনই বাড়ছে। এখন তো আর শুধু ঢাকায় না, সবজায়গায়ই হচ্ছে। আমাদের কলেজের কথাই চিন্তা করেন। ছাত্ররা কি শুরু করছে? কাউরে মানে না'।

'হুম'। আশফাক সাহেব যেন খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'মব সাইকোলজি নামে একটা বিষয় আছে। বাঙালি এইটাতে ওস্তাদ। ভীড়ের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে কিছু বলল। বাকিরা কিছু না শুনেই

বললে, ঠিক ঠিক। এই জিনিসটা ব্যবহার করতে জানতে হবে। যাতে আমি থাকুক, মন্ত্রী থাকুক, আসলে সাধারণ মানুষ পুরোপুরি আপনার বিপক্ষে চলে গেলে আপনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। সরকার এটা বুঝতে চাচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে, তাদের হাতে এটা ঠেকাবার মতো বাহিনী সবসময় নেই'

'তাহলে কি সরকার সরে যাচ্ছে?'

'সরকার সরে যাচ্ছে কিনা এখনই বলা যায় না। তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, সরকারের হাতে আর্মি আছে। সরকারও বিষয়টা সহজে ছাড়বে না।'

এই সময় লাবণী ঘরে ঢুকলো। তার সাথে প্রিয়াংকা না। এই বাড়ির পুরনো কাজের লোক। প্রিয়াংকা মারা যাবার পর থেকে এখানে আছে। লাবণী আজহার উদ্দিনের পাশে বসলো। মায়ের মৃত্যুর শোক থেকে লাবণীর চোখ মুখ এখনো ... তার চেহারায় খুব পরিবর্তন, যদিও সে বেশ স্বাভাবিক চলাফেরা করছে। বড় বড় গাঁড় পড়েছে। চোখের নিচে কালো কালি পড়েছে। চুলগুলো উসকোখুসকো। শুধু, দুঃখ এবং বেদনা ... হচ্ছে তার বয়সও বেড়েছে। আজহার উদ্দিন প্রিয়াংকার মৃত্যুর পর লাবণীকে ... নিয়ে তার দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু লাবণী নিজেকে অনেক তাড়া দিয়ে খুব পরিবর্তন করেছে। সমস্যা হচ্ছে লাবণীর এই পরিবর্তন আসলে কিভাবে আজহার উদ্দিনের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তা ধরতে পারছেন না। তার বদলে এক ধরনের অজানা দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

আজহার উদ্দিন লাবণীকে বললেন, 'তোমার না আজ কলেজে যাওয়ার কথা?'

লাবণী বলল, 'হুঁ, কলেজেই যাবো। চাচা বললেন ওনার সাথে যেতে। উনি নাকি ওইদিকেই যাবেন'।

আজহার উদ্দিন খানিকটা বিরক্ত হলেন। তিনি কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তিত। আশফাক সাহেবের সাথে জরুরি আলাপ-আলোচনা দরকার। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'ওনার তো বের হতে দেরি হবে। জরুরি মিটিং আছে'।

লাবণী শান্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা, আমি তাহলে যাই চাচা'।

আশফাক সাহেব সাথে সাথে বললেন, 'তুমি বাইরে একটু বসো। আমি আসছি'। লাবণী বের হতেই আশফাক সাহেব আজহারউদ্দিনকে বললেন, 'আমাদের আসলে এখন তেমন জরুরি কোনো কথা নেই। একটা বিষয়ে বলি, সরকার চাইলেও এখন লোকাল ইলেকশন দিতে পারবে না। এখন আসলে চোখ কান খোলা রেখে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই'। বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'আমাকে আজই ঢাকা যেতে হবে।

উপর মহল থেকে জরুরি তলব। এখন না বের হলে সময় মতো পৌঁছাতে পারবো না'।

আজহার উদ্দিন দরজা দিয়ে অসহায়ভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর তিনি তাকিয়ে রইলেন শরবতের গ্লাসের দিকে। গ্লাসের শরবত চক্রাকারে ঘুরছে। সেখানে ছোটছোট বুদবুদ

জোহরার হাতে কাঁচি।

সে কাঁচি দিয়ে ঘ্যাচং ঘ্যাচং চুল কাটছে। তার পায়ের কাছে চুলের স্তূপ। দৃশ্যটা আজহার উদ্দিন হজম করতে পারছেন না। তিনি জোহরার পিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছেন। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না। দৌড়ে এসে জোহরাকে থামাতেও ইচ্ছে করছে না। তিনি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। পায়ের শব্দটা খুব স্বাভাবিক রাখতে রাখতে জোহরা দুপুরে খেয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। জোহরার চুল কাটা নিয়ে তিনি কিছু বললেন না। যেন চুল কাটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। জোহরা প্রায়ই এমন করে চুল কাটে। জোহরা অবশ্য তার কথার কোনো জবাবও দিলো না। সে আপনমনে চুল কাটছে। চুল কাটা শেষে সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজেকে দেখতে যতটা খারাপ লাগবে বলে সে ভেবেছিল, ততটা খারাপ লাগছে না। বরং তার চেহারার মধ্যে কেমন একটা বালক বালক ভাব চলে এসেছে। সেই বালকের চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। গাল ভেঙে যাচ্ছে। তবে চেহারা জুড়ে স্পষ্টতই মায়া মায়া ভাব। এই ভাবটা জোহরার পছন্দ না। সে তার মধ্যে মায়া বিষয়ক কোনো কিছু দেখতে চায় না। কারণ, মায়া মানেই বিভ্রম।

জোহরা গিয়ে ভাতের টেবিলে বসলো। আজহার উদ্দিন নির্বিকারভাবে বললেন, 'চুল কাটছো ভালো কথা। এখন গোসল করো। গোসল করে ভাতের টেবিলে আসো। ভাতের মধ্যে চুল পড়বে'।

জোহরা খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলো, 'চুল পড়বে না। আমি গামছা দিয়ে মাথা মুড়ায়ে রাখছি'। এই সামান্য ঘটনায় আজহার উদ্দিন হোঁচট খেলেন। কারণ তিনি অবচেতনভাবেই জোহরার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। না তাকিয়েই কথা বলেছেন। জোহরার চুল কাটাটাকে তিনি পাত্তা না দেয়ার ভান করলেও আসলে বিষয়টা তার ভেতরে আঘাত করেছে। জোহরা যে তার মাথা ঢেকে রেখেছে এটা তিনি খেয়াল করেননি। তিনি বললেন, 'মাথা ঢেকে রেখেছো কেন?'

'তোমার জন্য। আমার চুল তোমার খুব পছন্দের জিনিস। সেই চুল আমি কেটে ফেলেছি। অপরাধ করেছি। স্ত্রীর উচিত স্বামীর পছন্দের জিনিসের যত্ন করা। আমি করেছি উল্টাটা। এই জন্য মাথা ঢেকে রেখেছি'।

'এতো কিছু ভাবলে চুল কাটলা কেন? চুল না কাটলেই পারতা!'

'পাপ করলে পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, আমি প্রায়শ্চিত্য শুরু করেছি। কিন্তু পাপের ওজন খুব ভারী। এত ভারী পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে পারবো বলে মনে হয় না'।

'কি পাপ করছো তুমি?'

'আপনেরে বিয়ে করে তুমি বানিয়েছি। বিয়ে করা পাপ না। কিন্তু সেই কারণে একজন মানুষরে খুন করলে সেইটা পাপ'।

'কিসব আবোল তাবোল বলতো তুমি?'

'আমি ঠিকই বলছি। পারভীন মারে আমরা দুইজন মিলে খুন করছি। আমাদের কারণেই সে মারা গেছে। এই বিয়ের কারণেই সে মারা গেছে'। জোহরা একটু থামলো। তারপর আজহার উদ্দিনের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আরেকটা কথা, তুমি কিছু বোঝো না, এই ভান আমার সাথে করবা না। তোমার এই ভান আমার পছন্দ না। তুমি যেমন ভালো, আমিও তেমন ভালো। মানুষটা এই দিকটা বোঝো নিতে পারে নাই। কষ্ট পাইছে। অনেক কষ্ট। আমার সাথে ভান কিছু না জানার ভান করবা না'।

'আমি কোনো ভান করছি না জোহরা'।

'তুমি ভান করতেছ, কিন্তু বুঝতেছো না। আসলে এটা তোমার দোষ না। অভ্যাস। ভান করতে করতে এটা তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন তুমি আর আলাদা করতে পারো না, কোনটা ভান আর কোনটা ভান না'।

আজহার উদ্দিন ভাতের নলাটা মুখে দিতে গিয়ে থমকে গেলেন। কিছুক্ষণ জোহরার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'চুল কাটার সাথে তোমার প্রায়শ্চিত্যের কি সম্পর্ক?'

এই কথায় জোহরা হাসলো। চাপা হাসি। সেই হাসিতে সাপের মতো এক ধরনের হিসহিস শব্দ। হাসি চেপে সে বলল, 'যেই যেই কারণে তুমি আমারে বিয়া করছো, সেই সেই কারণগুলা খুঁজে বের করতেছি। তারপর সেই জিনিসরে শাস্তি দিতেছি। সেই কারণের মধ্যে একটা ছিল আমার চুল। আমার চুল নাকি তোমার পছন্দের জিনিস। এই জন্য কেটে ফেলনাম'।

জোহরা থামলো। আজহার উদ্দিন কোনো কথা বললেন না। জোহরা আবার বলল, 'একটা কথা ভেবে হাসি আসতেছে। আমার মাথা আউলায়ে গেছে। কি বলি না বলি নিজেই বুঝি না। মাথার মধ্যে খালি ভয়'।

আজহার উদ্দিন এবারো কোনো কথা বললেন না। তিনি চুপচাপ ভাত খেয়ে যাচ্ছেন। এই প্রথম জোহরাকে তার অসহ্য লাগছে। শুধু অসহ্যই না, ভয়ও লাগছে। জোহরা উঠে এসে আজহার উদ্দিনের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার এই দাঁড়ানোতে এক ধরনের অশ্লীলতা আছে। জোহরা আজহার উদ্দিনের সাথে তার শরীর ঘষতে ঘষতে ফিসফিস করে বলল, 'কি কথা ভাইবা হাসি আসতেছে জানো?'

আজহার উদ্দিন মুখ তুলে জোহরার দিকে তাকালেন। কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না। জোহরা আবারো ফিসফিস করে বলল, 'আমার শরীরের অনেক জিনিসই তো তোমার পছন্দ। কই? সেইগুলা তো আমি নষ্ট করতেছি না...'। জোহরা কথা শেষ না করেই হি হি হি করে হেসে উঠলো। এই হাসি ভয়ংকর। আজহার উদ্দিন জোহরার এই হাসির সাথে পরিচিত না। তিনি খাবারের চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত ধুলেন। তারপর সময় নিয়ে জোহরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। জোহরার চোখ জোড়া কেমন লাল। এ ক'দিনে অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। নাসিমা বেগমের মৃত্যুর পর সব কিছু আগের মতো হয়ে গেলেও জোহরার যে এত পরিবর্তন ঘটেছে এটা আজহার উদ্দিন এতদিন খেয়াল করেননি। খেয়াল করা উচিত ছিল। তিনি জোহরার কাঁধ ধরে তাকে বারান্দায় ইজি চেয়ারটাতে বসালেন।

'কি হয়েছে তোমার?'

'কেন? ভয় পাইছো?' জোহরা হা হা হা করে হাসলো। তার চোখে উন্মাত্ত দৃষ্টি।

'না। ভয় পাবো কেন? ভয়ের কি আছে?'।

'তুমি ভয় না পাইলেও আমি কিন্তু ভয় পাই। অনেক ভয়'।

'কিসের ভয়?'

জোহরা সাথে সাথে জবাব দেয় না। সে তাকিয়ে থাকে রেলিং বেয়ে ওঠা পেয়ারা গাছের ডালের দিকে। সেখানে মা চড়ুই আর বাচ্চা চড়ুইটা খেলছে। সেই কানামাছি খেলা! অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জোহরা আজহার উদ্দিনের দিকে মুখ ফেরায়। তারপর ভয়ার্ত গলায় ফিসফিস করে বলে, 'খুনের ভয়। খুনের! আমি একটা মানুষরে খুন করছি। খুন!'

'এইসব তুমি কি বলছো!'

'তুমি আবার ভান করছো। আমার সাথে ভান করবা না। আমি সব জানি। সব'।

'কি জানো তুমি?'

'সব জানি। সুদেব ডাক্তার আমারে সব বলছে'।

আজহার উদ্দিনের মুখ মুহূর্তেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি জোহরাকে টেনে ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের দরজাটা বন্ধ করে জানালার পর্দাগুলোও টেনে দিলেন। তারপর জোহরার পাশে গিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কি বলেছে সুদেব ডাক্তার?'

'ঘটনা যা ঘটেছে, তাই বলেছে'।

জোহরার কথায় আজহার উদ্দিন যেন দপ করে নিভে গেলেন। তিনি শক্ত করে জোহরার হাত চেপে ধরে বললেন, 'বিশ্বাস করো, আমি বুঝি নাই। নাসিমা বিষ খেয়ে ফেলবে, এটা আমি বুঝি নাই। ঘটনার তো প্রায় বছর পার হতে চলল। এখন সে এই কাজ করবে এটা আমি কিছুতেই বুঝি নাই। বিশ্বাস করো, আমি এটা ঘুণাক্ষরেও বুঝি নাই। এখানে আমার কোনো হাত ছিল না। সেইদিন সে আমারে ডেকে নিল। কত কথা বলল। আমি আরো ভাবছি সব কিছু এখন ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে যে এই ঘটনা ঘটাবে সেটা কে জানতো! নাসিমার মুখ দিয়ে যখন ফেনা বের হচ্ছিল তখন আমি সুদেব ডাক্তারকে খবর দেই। সুদেব ডাক্তার আসতে আসতে সব শেষ। কিন্তু এই কথা জানাজানি হলে সেটা কি ভালো হইতো জোহরা? সামনে ইলেকশন। তার ওপর লাবণীর কথা চিন্তা করো...'।

জোহরা আজহারউদ্দিনের কথা শেষ করতে দিলো না। সে আজহার উদ্দিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বলল, 'সে আমার কারণে মরছে। আমার কারণে বিষ খাইছে। আমি তারে খুন করছি। আমি একটা খুনি। মানুষটা তার বাপ মা ভাই সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে আসছে। সাতাইশটা বছর তোমার জন্য আর তাদের মুখ দেখে নাই। সেই তুমি আমাকে বিয়ে করছো। তার মেয়ের বয়সি বয়স। এই লজ্জা সে নিতে পারে নাই। এইটা যে কতবড় লজ্জা! আমি তারে খুন করছি। আমি, আমি'।

জোহরা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তার চোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। আজহার উদ্দিন জোহরাকে শক্ত করে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। জোহরা তার সর্বশক্তি দিয়ে আজহার উদ্দিনকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনে একটা নষ্ট মানুষ। আপনে একটা খারাপ মানুষ। আপনার বাইরের চেহারাটা একটা মুখোশ। মুখোশ'। বলে সে আজহার উদ্দিনে জামার কলার শক্ত করে চেপে ধরলো। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে দিলো, 'আমি মানুষটারে স্বপ্নে দেখি। স্বপ্নে দেখি। মানুষটা খালি কান্দে। খালি কান্দে। অনেক কষ্ট হইছে মানুষটার। অনেক কষ্ট। অনেক কষ্ট'।

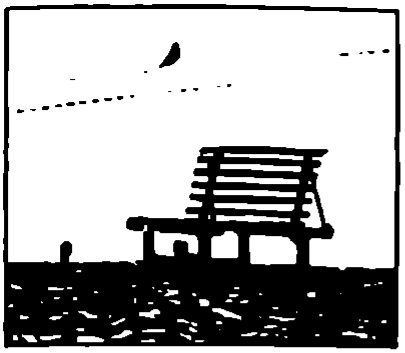

মোল্লা এবং রাম শব্দ দুটো একসাথে যায় না।

মজার ব্যাপার হচ্ছে বিরামপুর গ্রামের পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দুই গ্রামে এই দুই নামে দুটি হাঁট আছে। হাঁট দুটির নাম মোল্লার হাট এবং রামের হাট। জয়নাল কসাই আশে পাশের গ্রামের হাঁটগুলোতে গরু জবাই করে মাংস বিক্রি করে। সে প্রতি সপ্তাহে রামের হাঁট আর মোল্লার হাঁটেও যায়। কালুর যখন অন্য কাজ থাকে না, তখন সে জয়নাল কসাইয়ের সাথে কাজ করে। মাংস কাটার কাজ। টরকী বন্দরের রঘু কর্মকার কালুকে যে মস্ত দা বানিয়ে দিয়েছে, সেই দা কালুর হাতে যেন পাগলা ঘোড়া হয়ে ছোটে। সে চোখের পলকে আস্ত গরু নামিয়ে ফেলে।

আজ শনিবার। জয়নাল কসাইয়ের সাথে রামের হাঁটে এসেছে কালু। তার সাথে এসেছে রতন আর ফজলুও। হাঁট ঘেঁষেই বিশাল স্কুল মাঠ। খোলা মাঠের এক কোণায় কলা পাতা বিছিয়ে বসেছে জয়নাল কসাইয়ের মাংসের দোকান। ছোট ছোট ভাগে স্তূপ করে রাখা মাংস। মাংসের উপর ভনভন করে উড়ছে মাছি। ফজলু মাছি তাড়াতে তাড়াতে বলল, 'আপনে এত বড় দাও এমন কইরা নাড়ান কেমনে চাচা?'

কালু বলল, 'অভ্যাস। মানুষ হইলো অভ্যাসের দাস। অভ্যাসে মানুষ পারে না, এমন কিছু নাই'।

ফজলু বলল, 'এই কথাটা ঠিক না চাচা। মানুষ চাইলেই অভ্যাস বদলাইতে পারে। আবার নতুন অভ্যাস বানাইতে পারে'।

'একেবারে পারে না যে তাও না। তয় শেষ পর্যন্ত মানুষ ওই অভ্যাসেরই দাস'।

'না চাচা। ধরেন, যহন আমার বউ আছিলো, পোলা আছিলো। তহন আমার এক অভ্যাস আছিলো। এহন অভ্যাস অন্য। বেয়ান বেলা ঘুমেরতন উইঠা নদীর ধারে যাই। খাওন দাওনের বালাই নাই। আর আগে বেয়ান বেলা উইঠা গরম ভাত না পাইলে মাথাটাই গরম হইয়া যাইতো। তারপর ধরেন, জোয়ান একটা মর্দা পোলা আমি, বউ নাই। এমন মানুষের কত

খারাপ অভ্যাস থাকে। প্রথম প্রথম আমারো আছিলো। কিন্তু সেই বদ অভ্যাসওতো আমি ছাড়ছি চাচা। ছাড়ি নাই? কই এহন তো আমার কোনো সমস্যা হয় না। আসল কথা হইলো চাচা, মানুষ অভ্যাসের দাস না, অভ্যাসই মানুষের দাস'।

'এইটা তো ভালো বলছোস রে ফজলু। এমন কইরা তো আগে ভাবি নাই। তুই তো দেখি মাশাআল্লাহ ভালো কথা জানোস। জ্ঞানের কথা জানলে চুপচাপ থাকলে চলে নারে ফজলু। মানুষরে শোনান লাগে। কিন্তু তুই তো সারাদিন চুপচাপ ঝিম ধইরা বইসা থাকোস। এইটা ঠিক না!'

'আমি এক ভাদাইম্যা। আমার কথা কে শোনবো চাচা?'

'কার মধ্যে কি লুকাইয়া আছে, বোঝা বড় মুশকিল ফজলু। তয় সেই জিনিস লুকাই রাখলে চলবে না, বাইর করতে হবে'।

'সব লুকানো জিনিস কি বাইর করা ঠিক চাচা? ঠিক না। ধরেন, ভিতরে তো খারাপ জিনিসও লুকাই থাকে। সেইটা বাইর করন কি ঠিক?'

'খারাপ ভালো যাই থাকুক, কিছুই লুকাইয়া রাখন যায় নারে। একদিন না একদিন বাইর হয়ই। ভালো বাইর হইলে ভালো। কিন্তু খারাপ বাইর হইলে সমস্যা'। কালু গরুর উরুর বড় শক্ত একটা হাড্ডি দা দিয়ে সজোড়ে কোপ দিয়ে আলাদা করে ফেলে। তারপর বলে, 'খারাপ জিনিস বাইর হইলে, সেইটারে এমনে কোপ দিয়া কাইটা ফেলতে হবে। বিবেক হইলো এই ধারঅলা দাওয়ের মতোন। বিবেক বিবেচনা থাকলে খারাপ জিনিস নিয়াও চিন্তার কিছু নেই'।

'সব মানুষেরই কি বিবেক বিবেচনা থাকে চাচা? যদি থাকতো, তাইলে তো দুনিয়াতে কোনো খারাপ কাজ হইতো না। এত খারাপ মানুষও থাকতো না'।

'বিবেক বেবাকেরই থাকে ফজলু। কেউ কামে লাগায়, কেউ লাগায় না। বললাম না, বিবেক হইলো এই ধারঅলা দাওয়ের মতোন। এই দাও যদি কোনো কামে না লাগাই, ধার না দেই, তাইলে আস্তে আস্তে এই দাওয়ে জং ধইরা যাইবো। তহন আর এই দাও দিয়া কিছু কাটন যাইবো না। মানুষের বিবেকও অমন। ব্যবহার না করতে করতে একসময় জং ধইরা যায়। তহন মানুষ এমন কোনো কাম নাই করতে পারে না'।

ফজলু এই কথার কোনো জবাব দেয় না। সে তার হাতের কাপড়ের ঝাঁটা দিয়ে মাছি তাড়ায়। বড্ড মাছির উৎপাত। মাংসের ঘ্রাণ পেলেই দলে দলে ছুটে আসে। মাছি মাংস খায় না। মাছি খায় রক্ত। মাংস খায় কুকুর।

দূরে কয়েকটা কুকুর ঝিমাচ্ছে। এক টুকরো হাড্ডি কিংবা মাংসের লোভ। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। সুযোগ পেলেই ছুটে আসবে।

দুনিয়াটাই এমন। কেবল রক্ত আর মাংসের লোভ।

অন্ধকার নেমেছে।

মাঝারি সাইজের নৌকাটায় তিন জন চেপে বসেছে। কালু, ফজলু আর রতন। নিঃশব্দ অন্ধকারে বিলের পানিতে বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ খুব কানে বাজে। রতন নৌকার গলুইতে পা ছড়িয়ে বসেছে। নৌকার তলায় ছোট্ট এক ফুঁটো। সেই ফুঁটো দিয়ে পানি ঢুকছে নৌকায়। ফজলু মাঝখানে বসে কলাগাছের খোল দিয়ে পানি সেঁচে বাইরে ফেলছে। রতন আজকাল কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। সে আর লঞ্চঘাট গিয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করে না। কারো সাথে তেমন কথা বলে না। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এখন যেমন তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে। রতনের খুব ইচ্ছা সে একদিন কালুর নৌকায় চড়ে হাঁটে যাবে। তার ইচ্ছে আজ পূরণ হয়েছে। রাবেয়াকে অনেক চেষ্টায় রাজী করিয়েছে কালু। কিন্তু ছেলেটা সেই দুপুর থেকেই চুপ। একদম চুপ। কালু রতনকে ডাকে, 'ও রতন, হাঁট কেমন দেখলা?'

রতন কালুর প্রশ্নের জবাব দেয় না। সে চুপচাপ বসে থাকে। তার ভাবনায় একটা প্রশ্নের কোনো উত্তর সে খুঁজে পায় না, এত বড় হাঁট, এত এত মানুষ, কিন্তু তার বাবা কোথাও নেই কেন?

সে হঠাৎ কালুকে বলে, 'দাদা, আপনের একটা বড় দাও আমারে দিবেন?'

রতনের এমন প্রশ্নে কালু খানিকটা অবাক হয়, 'দাও দিয়া তুমি কি করবা দাদা ভাই?'

রতন সাথে সাথে জবাব দেয় না। অনেকক্ষণ কেটে যায়। তারপর হঠাৎ বলে, 'রাইতের বেলা আমার অনেক ডর লাগে। আপনের অতবড় দাও থাকলে আর ডর লাগবো না।'

ঠাণ্ডা বাতাসে কালুর কাশির দমক যেন খানিকটা বাড়ে। সে কাঁশি চেপে রাখতে রাখতে বলে, 'আন্ধাররে সবাই ডরায় দাদা। সবাই'।

'কেন? আন্ধাররে ডরায় কেন? আন্ধারে কি ভূত থাকে?'

'ভূত আন্ধারে থাকে না দাদা ভাই, ভূত থাকে মনে। আন্ধার হইলে মনের মইধ্যের তন সেই ভূত বাইর হইয়া আসে'।

'ভূত কি কুপি বাতির আলোতেও আসে?'

রতনের এমন কথায় কালু হেসে ফেলে, 'তোমার কি হইছে দাদা ভাই? এখনও ডর লাগতেছে?'

'না, এখন ডর লাগতেছে না। রাইতের বেলা বাড়িতে থাকলে ডর লাগে। অনেক রাইতে আমাদের ঘরে ভূত আসে। বেড়া ধইরা টান মারে। আম্মায় আর বু সারা রাইত জাইগা থাকে, ঘুমায় না। রাইতে নাকি ভূত আসে'।

'কি বলো এইসব? কই? তোমার আম্মায় তো আমারে কিছু বলে নাই। ও ফজলু, রতন এইগুলা কি বলে?'

কালুর প্রশ্নে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকা ফজলুর যেন ধ্যান ভাঙে, 'খেয়াল করি নাই চাচা। আবার বলেন?'

'রতন কি কয়? অগো বাড়িতে নাকি রাইতে ভূত আসে। বেড়া ধইরা ঝাঁকায়? ঘটনা কি?'

'কই? আমি তো কিছু শুনলাম না। চাচীও তো কিছু বলল না। আইজ বেহানে তো রতনের মা'র সাথেও দেখা হইলো। কই? সেও তো কিছু বলে নাই'।

কালু অন্ধকারেই রতনের দিকে তাকায়, 'কি হইছে খুইলা কও তো দাদাভাই?'

রতন আবার চুপ মেরে যায়। সে আর কোনো কথা বলে না। ফজলু [illegible] থেকে উঠে এসে রতনের পাশে বসে, 'কি হইছে রতন? আমারে বল'। রতন তারপরও কোনো জবাব দেয় না। একসময় সে ফিসফিস করে বলে, 'আন্ধার হইলে ডর লাগে। অনেক ডর লাগে'। ফজলু দুহাত দিয়ে রতনকে জড়িয়ে ধরে। তারপর কালুকে ডেকে বলে, 'ও চাচা, ঘটনা কি হইছে বলেন তো। কিছুই তো বুঝতেছি না। পোলাডা তো ডর পাইছে অনেক'।

'বুঝতেছি না তো। আমারে তো কেউ কিছু বলে নাই রে'।

কালু ফজলুকে [illegible] নিয়ে রতনের পাশে এসে বসে। তারপর রতনের মাথায় হাত রেখে বলে, 'ভূত বলতে কিছু নাই দাদাভাই। তুমি ডর পাইও না দাদা ভাই। ভূত বলতে আসলে কিছু নাই'।

রতন হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সেই কান্নার ফোঁপানোর শব্দের ভেতর থেকে সে ফিসফিস করে বলে, 'ভূত না দাদা, মানুষ। খারাপ মানুষ। আমি দেখছি। খারাপ মানুষ'।

'কি দেখছো তুমি দাদাভাই?'

রতন কি দেখেছে তা বলে না। সে কেবল কালুর বুকের ভেতর ঢুকে যেতে যেতে বলে, 'আব্বা আসে না কেন দাদা? আব্বা কেন আসে না?'

গভীর রাত।

রাবেয়া রতনকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। ঘুমের মধ্যেও বুকের ভেতর কেমন অদ্ভুত এক অস্বস্তি। ঘুমের ভেতরই তার মনে হচ্ছে, এই বুঝি বেড়া ধরে কেউ ঝাঁকালো। সেই শব্দে এখনই তার ঘুম ভেঙে যাবে।

'ঠক ঠক ঠক, কুউউ, কুউউ...'।

আবার সেই শব্দ! রাবেয়ার ঘুম ভেঙে যায়। সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। পাশে লতিফা বানু ঘুমাচ্ছেন। রতনও। রাবেয়ার বুক ধুকফুক করে কেঁপে ওঠে। সে ফিসফিস করে ডাকে, 'আম্মা, ও আম্মা, ওঠেন, তাড়াতাড়ি ওঠেন'। রাবেয়া অবাক হয়ে খেয়াল করলো তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। সে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে লতিফা বানুকে ডাকার চেষ্টা করে, কিন্তু তার গলা চিরে কোনো শব্দ বের হয় না। 'কুউউ, কুউউ...'। আবারও শব্দ। রাবেয়া লতিফা বানুর গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয়। একবার, দুইবার, তিনবার। কিন্তু লতিফা বানু গাঢ় ঘুমে ডুবে আছেন। তার ঘুম ভাঙে না। প্রবল আতঙ্কে রাবেয়ার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। এইবার ঘরের বেড়ায় ঠক ঠক শব্দ হয়। কেউ একজন বেড়া ধরে নাড়ছে? রাবেয়া কি করবে ভেবে পায় না। সে ঝট করে চৌকির নিচ থেকে বটিটা বের করে। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'কে ওইখানে? কে?'

কোনো জবাব আসে না। রাবেয়া এবার চেঁচায়, 'কে ওইখানে? কোপ দিয়া কল্লা নামাই ফেলবো। আমার হাতে মাছ কোটার বটি আছে। কে ওইখানে, কথা বলে না কেন? কে?'

সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, তার গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হয় না। কিন্তু বাইরের শব্দটা সে স্পষ্ট শুনতে পায়, 'ঠক, ঠক, ঠক'। রাবেয়া হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায়, বেড়ায় না, শব্দটা আসছে দরজার দিক থেকে। সে দরজার দিকে তাকায়। ঠিক সেই মুহূর্তে স্পষ্ট গলার আওয়াজটা শুনতে পায় রাবেয়া, 'রাবু, রাবু, দুয়ারডা খোলো। আর কতক্ষণ এই রাইতে বাইরে দাঁড়ায় থাকবো। বিস্টিতে তো ভিজ্যা কাউয়া হইয়া গেলাম। দুয়ারডা খোলো'।

ফরিদ আসছে! ফরিদ!!

রাবেয়া পাগলের মতো দরজার দিকে ছুটে যায়। দরজার খিলে হাত দিতে গিয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। তার বুকের ভেতর জমে ওঠা অভিমানের ছোট ছোট ঢেউগুলো যেন জলোচ্ছ্বাস হয়ে বুকের ভেতর আছড়ে পড়তে থাকে। নাহ্! সে মানুষটার সাথে কোনো কথাই বলবে না। কেবল দরজার খিল খুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। অন্ধকারে। বৃষ্টির ভেতর। থাকুক মানুষটা। নিজের মতো করেই থাকুক। সে আর কোথাও থাকবে না। কোথাও না।

কিন্তু মানুষটাকে একবার দেখার জন্য রাবেয়ার বুকের ভেতরটা উথাল পাথাল করে। সে আলতো হাতে দরজার খিল খোলে। প্রবল বাতাস আর বৃষ্টির ঝাপটায় দরজাটা দুম করে খুলে যায়। বাইরে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। সেই ঝড়-বৃষ্টিতে রাবেয়া মানুষটাকে কোথাও দেখতে পায় না। কেবল বৃষ্টির ঝাপটায় সে ভিজে যায়। তখনই সেই শব্দটা আবার ফিরে আসে। কুউউ, কুউউ... ঠক ঠক ঠক। আবার ফিরে আসে। আবার।

প্রবল আতঙ্ক নিয়ে রাবেয়ার ঘুম ভাঙে। সে স্বপ্ন দেখছিল! কিন্তু ঘুমভাঙা অবস্থা অন্ধকারে হঠাৎ বেড়ার কাছে কিছু একটা নড়তে দেখে সে। একটা লোমশ হাত বেরিয়ে এসেছে বেড়ার ফাঁক গলে। রাবেয়া চিৎকার করে লতিফা বানুকে ডাকে, 'আম্মা, ও আম্মা!'

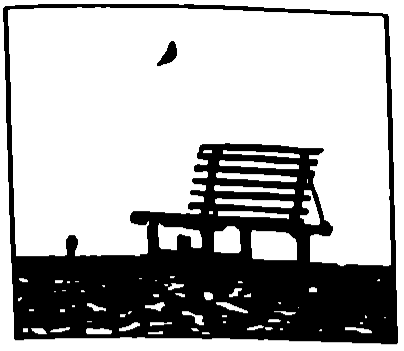

ব্যাপারটা চুপিচুপি ঘটে গেছে।

আর কেউ টের পেয়েছে কি-না, লাবণী জানে না। তবে সে টের পেল স্পষ্ট। ঠিক এই মুহূর্তে। সে বসে আছে পুকুর ধারে। বিকেলটা সরে আসছে প্রায়। এই মুহূর্তে সে হঠাৎ টের পেল তার কেমন শীত শীত লাগছে। চোখ তুলে চারপাশে তাকালো লাবণী। কি বিষণ্ন প্রকৃতি! এত বিষণ্ন কেন চারধার? গাছের পাতাগুলো কেমন হলুদ হয়ে আসছে। কুয়াশার আবছা চাদর। আরিহ! হেমন্ত চলে এসেছে! এত চুপিচুপি হেমন্ত চলে এলো!

লাবণীর হাতে উলের কাটা। হালকা নীল রঙের উল। চাদরটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অনেক দিন থেকেই বুনছে সে। কিন্তু কেন যেন শেষই হতে চাচ্ছে না। এই রঙটার সাথে আরো কোনো একটা রঙ মেশাতে চায় লাবণী। কিন্তু কোনো রঙই যেন মেশে না। কিছুদূর বুনেই তাই আবার খুলে ফেলতে হয়। তখন আবার অন্য নতুন কোনো রঙ। চাদর বুনতে গিয়ে লাবণীর স্পষ্ট মনে হচ্ছে, জগতের সবকিছুই রঙের খেলা। প্রকৃতি কিংবা জীবন, সবখানেই বিচিত্র সব রঙের সমাহার। কিন্তু রঙ মিলাতে গেলেই সমস্যা।

শরিফার মা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, লাবণী খেয়াল করেনি। হঠাৎ দেখে খানিক চমকে গেল সে, 'তুমি কখন আসলা খালা?'

'অক্ষণই আসলাম। বাড়িত মেহমান আসছে। আপনেরে খোঁজে'।

'কে আসছে?'

'আশফাক সাব আসছে। আপনের আব্বায় তো বাড়িত নাই। আপনের কাছে নাকি দরকার আছে'।

লাবণীর এই মুহূর্তে কিছুতেই এখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। এই পুরোটা সময় তার একান্ত নিজের বলে মনে হচ্ছিলো। এই কুয়াশা। এই আনচায়া বিকেল। এই হলুদ পাতাদের টুপটাপ ঝরে পড়া কিংবা চারপাশ জুড়ে নিঃশব্দে থমকে থাকা এই অদ্ভুত বিষণ্ণতা। সব তার নিজের বুকের

ভেতরের পৃথিবী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু বিষয়টা ভালো দেখায় না। বাড়িতে সে ছাড়া আর তেমন কেউ নেই।

আশফাক সাহেব আজ আর বৈঠকখানায় না, বসে আছেন মূল ঘরের বারান্দায়। আশফাক সাহেব লাবণীকে দেখে বললেন, 'আমি আজ ভোরেই ঢাকা থেকে ফিরেছি। তোমার বাবার সাথে জরুরি দরকার ছিল'।

লাবণী বসতে বসতে বলল, 'তিনি স্ত্রী সেবায় গেছেন। সুদেব ডাক্তারের চেম্বারে। তার স্ত্রী অসুস্থ'।

'কি সমস্যা তার?'

'আমি জানি না। সমস্যার কথা জানতে ইচ্ছা হয় না'। লাবণীর চেহারায় একটা বেপরোয়া ভাব।

'সমস্যার কথা না জানা তো কোনো সমাধান না'।

'সমস্যার কথা জানাটাও কোনো সমাধান না। বরং যতক্ষণ না জেনে থাকা যায়, ততক্ষণ শান্তি'।

'এটা ঠিক না লাবণী। সমস্যা জানলে সমাধানটাও সহজ হয়। পাশ কাটাই গেলে সেটা হয় না'।

'সবাই সমাধান চায়, এমন তো নাও হতে পারে। আর...'। লাবণী কথা শেষ করলো না। তার ঠোঁটে কোণে এক চিলতে হাসি। অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। আশফাক সাহেব সেই হাসিতে খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করেন। তিনি বললেন, 'আর কি?'

লাবণী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আর সকলের সমাধানের ধরণও এক নাও হতে পারে। তাই না?'

আশফাক সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, তা হতে পারে'।

লাবণী বলল, 'তাহলে? তাহলে বিষয় হলো জগতে ভালো-মন্দ কিছু নাই। যার যার ভালো-মন্দ তার তার কাছে। যার যার সমাধানও তার তার কাছে। নিজের মতোন করে আলাদা। তাই তো?' বলেই লাবণী আবার হাসলো। আশফাক সাহেব লাবণীর এই হাসিতে এক ধরনের মুগ্ধতা অনুভব করেন। লাবণী পরীর মতো মেয়ে। কিন্তু লাবণীর আচরণে তিনি বিভ্রান্তও কিছু কম হন না। এই মুহূর্তে তিনি পুরোপুরি বিভ্রান্ত। তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে লাবণীর দিকে তাকিয়ে আছেন। আজকাল লাবণীর সাথে তার প্রায়ই কথা হয়। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে মেয়েটা কোথাও খুব বড় রকম বদলে গেছে। এই সময়টায় অন্যদের থেকে লাবণী ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। একা হয়ে গেছে। মায়ের মৃত্যুটা তাকে প্রবলভাবে আঘাতগ্রস্ত করেছে। কিন্তু সেই

আঘাতটা সে কাউকে দেখতে দেয়নি। বুঝতেও দেয়নি। চুপ করে বুকে চেপে রেখেছে। এটা ভয়ের কথা। কারণ চেপে রাখা কষ্ট ভয়ঙ্কর।

তবে মায়ের মৃত্যুর পর আশফাক সাহেবের সাথে লাবণীর এক ধরনের যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। এবং আশফাক সাহেব খেয়াল করেছেন, মেয়েটার ভিতর কিছু একটা আছে। সেই কিছু একটা প্রায়ই মেয়েটার সামনে তাকে অপ্রস্তুত করে ফেলে। এমনকি কখনো কখনো তার মনে হয়, লাবণী তার চেয়ে বছর ত্রিশের ছোট নয়, বরং সমবয়সি কিংবা বড়। যেমনটা তার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে। তার লাবণীর সামনে নিজেকে অথৈ জলে সাঁতার না জানা ডুবন্ত মানুষ মনে হচ্ছে।

'আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে'। লাবণী একটু থামলো। তার হাতে এখনো সেই অর্ধসমাপ্ত নীল চাদর। লাবণী চাদরটা ভাঁজ করতে করতে বলল, 'আর একটা কথা, আমি আজকাল অন্যদের সমস্যা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাই না। আসলে জীবন যার, সমস্যাও তার। তবে তার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে, প্রত্যেক মানুষের জীবনের সাথে যুক্ত থাকে অন্য কারো না কারো জীবন। তাই কারো ভালো-মন্দের সাথে অন্যদের ভালো-মন্দও নির্ভর করে'। লাবণী তার জরুরি কথা না বলেই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। আশফাক সাহেবও কেন যেন লাবণীর জরুরি কথা জানতে চাইলেন না। তিনি বসে থাকলেন আজহার উদ্দিনের ফেরার অপেক্ষায়। আশফাক সাহেব হঠাৎ খেয়াল করলেন, দেয়ালে বাবা মায়ের সাথে ফ্রেম বাঁধানো যে বড় ছবিটি ছিল লাবণীর, সেই ছবিটি সেখানে নেই! আশফাক সাহেব মাগরিবের আজান পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। কিন্তু আজহার উদ্দিন এলেন না।

আজহার উদ্দিন বাড়ি ফিরলেন গভীর রাতে। আজহার উদ্দিনকে কোনো কারণে অত্যন্ত আনন্দিত দেখাচ্ছে। সম্ভবত লাবণীর বিয়ের বিষয়ে তিনি কোনো সুসংবাদ পেয়েছেন। তার ওপর জোহরাকে নিয়েও তিনি আজ খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। সুদেব ডাক্তার জোহরাকে দেখে বলেছে, চিন্তার বিশেষ কিছু নেই। জোহরাকে কিছুদিনের জন্য তারা বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়। আজহার উদ্দিনেরও পরামর্শ পছন্দ হয়েছে। সুযোগ মতো কিছু দিনের জন্য তিনি জোহরাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিবেন।

আজহার উদ্দিন বাড়ি ফিরে প্রথমেই ঢুকলেন লাবণীর ঘরে। তিনি লাবণীকে কিছু কথা বলতে চান। অনেকদিন থেকেই তিনি কথাগুলো বলবেন বলে ভাবছিলেন। কিন্তু সুযোগ হচ্ছিলো না। তিনি অপেক্ষা করছিলেন লাবণীর মানসিকভাবে স্থীর হয়ে ওঠার। নাসিমার মৃত্যুর পর থেকে তিনি আসলে লাবণীকে আর বুঝে উঠতে পারছেন না। তার প্রায়ই মনে হয়, লাবণী সুস্থ, স্বভাবিক। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না, কোথাও বড় ধরনের ঝামেলা আছে। এই লাবণীকে তিনি চেনেন না। আজ তিনি ঠিক করে এসেছেন লাবণীকে কিছু কথা বলবেন। কথাগুলো লাবণীকে বলা দরকার। তিনি মনে মনে কথাগুলো গুঁছিয়ে এনেছেন। আজহার উদ্দিন লাবণীর রুমে ঢুকে দেখেন লাবণী তার জামা-কাপড় ভাঁজ করছে। তিনি কেঁশে গলা পরিস্কার করলেন। তারপর হড়বড় করে তার গুঁছিয়ে আনা কথাগুলো বলা শুরু করলেন, একজন পিতা হিসেবে তিনি তার দায়িত্ব সঠিকভাবেই পালন করেছেন। স্ত্রী কন্যার কোনো চাহিদা তিনি অপূর্ণ রাখেননি। তারপরও এখন তিনি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি অন্যদের ব্যক্তিগত জীবনেও যতটা না করলেই নয়, তার বেশি হস্তক্ষেপ করেননি। লাবণী বিয়ে করতে চায়নি, তিনি লাবণীর বিয়ে নিয়ে আর জোরও করেননি। এমনকি তিনি ভাবছেন, লাবণী বললে তিনি লাবণীর পছন্দের কারো সাথেই লাবণীর বিয়ে দিবেন। তবে লাবণীকে অবশ্যই তার কাছে এসে সেটা বলতে হবে।

এই পর্যন্ত এসে আজহার উদ্দিন থামলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লাবণীকে খেয়াল করছেন। তিনি আসলে ইঙ্গিতে বাদলের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। এতে লাবণী হয়তো তার প্রতি কিছুটা নরম হবে। লাবণী অবশ্য এতক্ষণে একবারও তার দিকে ফিরে তাকায়নি। আজহার উদ্দিন বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি জানেন, লাবণী কখনোই তার কাছে এসে বাদলকে বিয়ে করার কথা বলবে না। আর বললেও তিনি এমন ব্যবস্থা করে রাখবেন, যে বাদল নিজে থেকেই কখনো লাবণীর ত্রিসীমানায় আসার সাহস করবে না। তবে লাবণীর বিয়ে নিয়ে তিনি তার পরিকল্পনা মতো ঠিকই আগাচ্ছেন। মন্ত্রী সাহেবও চাচ্ছেন শীঘ্রই লাবণীকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে এসে কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে। তার ছেলে বিদেশ থেকে চলে এসেছে। শুভস্যম শীঘ্রম বলে একটা ব্যাপার আছে। শুভ কাজে দেরি করতে নেই।

আজহার উদ্দিন আজই লাবণীর কানে কথাটা তুলতে চাচ্ছেন। সময় চলে যাচ্ছে। তবে তিনি ধৈর্য্য ধরতে জানেন। আজহার উদ্দিন খুব নরম গলায় বললেন, 'মা রে। আমি কখনো তোমাদের কারো মন্দ চাই নাই।

হয়তো তোমাদেরকে বুঝাতে পারি নাই। এটা আমার ভুল। কিন্তু মা, আমি একলা একটা মানুষ। ঘরে বাইরে কত দিক যে আমাকে সামলাতে হয় সেটা শুধু আমি জানি। তোমরা তা জানো না। তোমার মায়ের বিষয় নিয়ে তোমাকে একটা কথা বলার ছিল'।

লাবণী চোখ তুলে আজহার উদ্দিনের দিকে তাকালো। তারপর বলল, 'কি কথা?'

'তোমার মনে আছে? নাসিমা যেদিন মারা যায়, সেদিন সে আমাকে ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলছিল?'

লাবণী এই প্রশ্নের জবাব দেয় না। সে যেভাবে কাজ করছিল, ঠিক সেই ধীর স্থীরভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। আজহার উদ্দিন কিছুটা চুপ থেকে আবারো বললেন, 'তোমার বিষয়ে নাসিমা আমাকে কিছু কথা বলে গেছে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, তার কথাগুলো আমি রাখবো'। বলে আজহার উদ্দিন খানিক বিরতি নিলেন। তিনি লাবণীর প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছেন। লাবণীর চোখেমুখে স্পষ্ট কৌতূহল। আজহারউদ্দিন সেই কৌতূহল দেখে উৎসাহিত বোধ করলেন। তিনি বললেন, 'তোমার মা আমাকে তোমার বিয়ে নিয়ে কিছু কথা বলে গেছে। তবে সেই সব কথা আমার তোমাকে বলা নিষেধ বলে আমি বলতে পারবো না। কিন্তু তার কথামতো কাজ আমি করেছি। সে বেঁচে থাকতে তাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। এবার তার এই কথাগুলো আমি রাখতে চাই'। আজহার উদ্দিন পাঞ্জাবির হাতায় চোখ মুছলেন। চোখের জলে তার গালের খানিকটা ভিজে গেছে। তিনি লাবণীর কাছে গিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'তার কথামতোই আমি তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। পাত্রপক্ষের পরিচয় শুনলেই তুমি বুঝবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেসব কিছুই আমি বলতে চাই না। শুধু এইটুক বলি, আমি তোমার মায়ের কথাটা রাখতে চাই। তার ওপর অনেক অন্যায় আমি করছি। এখন বাকি সব তোমার হাতে। আমি তোমার অমতে কিছু করবো না'।

লাবণী ধীরে আজহার উদ্দিনের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলো। তারপর বলল, 'আপনি কারো মতের তোয়াক্কা করেন আব্বা? আমি না বললে কি এইখানে আপনি আমার বিয়ে দিবেন না? অবশ্যই দিবেন। আপনি আপনার পরিকল্পনা মতোই সব কাজ করবেন। শুধু শুধু আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? আপনার একটা মুখোশ আছে। সবাই ওই মুখোশটাই দেখে। ভিতরের আপনেরে দেখে না। সেই মুখোশটার একটা জাদু আছে। আপনের অনেক খারাপ কাজও ওই যাদুর কারণে মানুষ ধরতে পারে না।

মনে হয় আপনি যা করছেন, ঠিকই করছেন। আপনার একটা অহংকারও আছে, আপনি কখনো কোথাও হারেন নাই। সবখানে জিতছেন। যেখানে যা চেয়েছেন, সব পেয়েছেন। নানান উপায়ে আদায় করছেন। এবং সামনেও করবেন। তাহলে শুধু শুধু আমার অনুমতি কেন চাচ্ছেন?'

আজহার উদ্দিন অনেক দিন থেকেই লাবণীকে চিনতে পারছিলেন না। কিন্তু আজ যেন আগের সবকিছুকেই লাবণী ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আজহার উদ্দিনের মনে হচ্ছে তিনি কঠিন কোনো মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার সামনে দাঁড়ানো এই মেয়েটি তার মেয়ে না। এ অন্য কেউ। যার বয়স তার থেকেও বেশি। অনেক বেশি। তিনি কোনো কথা বলতে পারলেন না। লাবণী তার ভাঁজ করা কাপড়গুলো একটা বড় ব্যাগে ভরলো। আজহার উদ্দিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কোথাও যাচ্ছো?'

'হুম। আমি কাল ভোরে ফরিদপুর যাচ্ছি। মামাবাড়ি। মা'র কাছে অনেক গল্প শুনছি। আপনার এই বিয়ের আগ থেকেই, প্রত্যেক রাতে মা আমাকে জড়াই ধরে ঘুমাতো। আর তার ফরিদপুরের বাড়ির কথা বলতো। ছোটবেলার কথা বলতো। তার বাবা-মা, ভাইদের কথা বলতো। আর রাত ভরে কানতো...'।

আজহার উদ্দিন লাবণীকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে শক্ত গলায় বললেন, 'তুমি আসবা কবে?'

'চলে আসবো আব্বা। আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করেন। আমি বিয়ের আগেই চলে আসবো। আপনার জন্যই চলে আসবো'।

'আমার জন্য চলে আসবা?' আজহার উদ্দিন অবাক হন। তিনি জানেন তাকে নিয়ে লাবণীর ভেতর পিতৃপ্রেমের কোনো অনুভূতি বাকি নেই। আছে তীব্র ঘৃণা। আচ্ছা, লাবণী কি নাসিমার বিষপানের বিষয়টা জানে? জানার কথা না। জোহরা বা সুবল ডাক্তার কারো সাথেই লাবণীর কোনো যোগাযোগ হয় না।

লাবণী হঠাৎ আজহার উদ্দিনের দিকে এগিয়ে এসে খাটের কোণায় বসে। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'আব্বা। জীবনে খালি জিততেই হয় না। হারতেও হয়। আপনে জিততে জিততে হারার সাধ ভুলে গেছেন আব্বা'।

আজহার উদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। লাবণীর সামনে তার অস্বস্তি লাগছে। লাবণী আজহার উদ্দিনের চোখে চোখ রেখে শান্ত কণ্ঠে বলে, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। খুব তাড়াতাড়ি'। আজহার উদ্দিন স্থীর হয়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন। তার হঠাৎ মনে হলো, লাবণী বড় কিছু একটা করতে যাচ্ছে। তাকে এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে বড় কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু কি করতে চায় লাবণী?

বাদল বিষয়ক কিছু না তো?

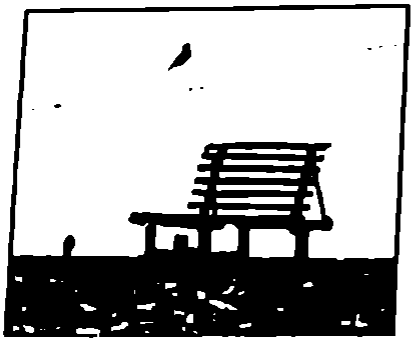

গভীর রাতে ঘুম ভাঙলো বাদলের।

বাইরে লোকজনের সমাগম। এত রাতে কে ডাকে তাকে? মোফাজ্জল হোসেনের গলা চিনতে একটু সময় লাগলো বাদলের। সে দরজা খুলে চমকে গেল। মোফাজ্জল হোসেনের সাথে মধু মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। মধু মিয়ার গায়ে লাল চাদর। সাথে মাদারীপুর শহরের পুরান বাজারের রহমত। রহমতের চোখ টকটকে লাল। হাতে পাঁচ ব্যাটারির লাইট। মধু মিয়া আতাহার উদ্দিনের খাস লোক। সে বাবুর্চির কাজ করে। তার হাতের রান্নার কথা আশেপাশের কয়েক জেলার মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তবে আতাহার উদ্দিনের বিপক্ষ দলের মানুষ বলে ভিন্ন কথা। তাদের ধারণা, মধু মিয়ার বাবুর্চিগিরি আসলে একটা ছদ্মবেশ। সে রান্নার সময় ছোরা পেতে বসে থাকে। রান্না করে তার সাথের রহমত। মধু মিয়ার কাজ অন্য। সেই অন্য কাজের কথা কেউ মুখ ফুটে বলে না। তবে আশেপাশে কোনো খুন খারাবি হলে সবাই ফিসফিস করে। সেই ফিসফিসানিতে মধু মিয়ার নামটা কেন জানি শোনা যায়! বাদল অবশ্য মধু মিয়াকে কখনো উঁচু গলায় কথা বলতেও দেখেনি। বরং আতাহার উদ্দিনের বাড়িতে থাকতে মধু মিয়া বাদলকে খুব সম্মান করেই কথা বলতো। সে শিক্ষিত মানুষকে সম্মান করে। তার ধারণা, বাদল বিশাল বিদ্বান মানুষ।

বাদল গায়ে জামা চড়াতে চড়াতে বলল, 'মধু ভাই, এত রাতে আপনে এখানে? কি ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না মাস্টার সাব। আপনেরে দেখতে আসছি। দেখতে মন আনচান করতেছিল। কতবছর এক সাথে রইছি'।

'তাই বলে এত রাতে? কি বলেন মধু ভাই? কোনো খারাপ খবর-টবর নাই তো? বাড়ির সবাই ভালো?'

'বাড়ির সবাই ভালো'।

বাদলের খুব ইচ্ছা করে লাবণীর কথা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু সে জানে, এটা ঠিক হবে না। বাড়ির সবাই লাবণীর বিষয়টা কম বেশি জানে। আর বাদল চায় না এই নিয়ে কোনো রকম জল ঘোলা হোক। সে মধু মিয়াকে বলে, 'আসেন, ঘরে আসেন মধু ভাই'।

মধু মিয়া বলে, 'না মাস্টার সাব। ঘরে যাবো না। আপনেরে দেখতে আসছিলাম। দেখা শেষ, এখন চইলা যাবো। যাওয়ার আগে দুইটা কথা আছিলো'।

'কি কথা?' বাদলের হঠাৎ মনে হয়, কোথাও বড় কোনো ঝামেলা আছে। মধু মিয়া মোজাম্মেল হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনে ঘরে যান স্যার। আমার মাস্টার সাবের সাথে একটু পেরাইভেট কথা আছে, কথা শেষে আমরা চইলা যাবো'। মোজাম্মেল হোসেন কোনো কথা বলেন না। তিনি চুপচাপ চলে যান। মোজাম্মেল হোসেন ভালো করেই জানেন, কোথায় নাক গলাতে হয়, আর কোথায় হয় না।

মধু মিয়া তার লাল চাদরের ভেতর থেকে একটা খাম বের করে। খামটা বাদলের হাতে দিয়ে বলে, 'আপনের জন্য আজাহার সাব চিঠি পাঠাইছে। এই চিঠি মন দিয়া পড়তে বলছে। আমাগো সামনে বইসা চিঠি পড়তে বলছে। আমরা চিঠির জবাব নিয়া যাবো'।

বাদল খাটপট খামটা খোলে। আজাহার উদ্দিন সাধারণত নিজ হাতে কাউকে চিঠি লেখেন না। কিন্তু এই চিঠিটা তার নিজের হাতের লেখা। বাদল আজাহার উদ্দিনের হাতের লেখা চেনে।

'বাদল,

তোমাকে আমি বিশেষ স্নেহ করি। আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকের প্রতি আমার কর্তব্য যতটুকু সম্ভব পালন করতে। এবং চাই অন্যরাও তাদের কর্তব্য ঠিকঠাক পালন করুক। তুমি তোমার একটা কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করোনি। লাবণীর মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনেও তুমি আসো নাই। এতে আমি যারপরনাই মর্মাহত। আমি চাই না, লাবণীর সাথে তোমার আর কোনো যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ হোক। মায়ের মৃত্যুর পর লাবণী মানসিকভাবে কিছুটা ভেঙে পড়েছে। সে অনেক উল্টাপাল্টা চিন্তা করে। এই সময়ে সে হয়তো তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারে। আমি চাই না, সে তোমার সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ করুক। আমি কৃতজ্ঞ মানুষ পছন্দ করি। অকৃতজ্ঞ মানুষ অকৃতজ্ঞ কুকুরের চাইতেও অধম। সমস্যা হচ্ছে, কুকুর কখনো অকৃতজ্ঞ হয় না, অকৃতজ্ঞ হয় মানুষ।

বি:দ্র: এই পত্রের বাহক হিসেবে. মধু মিয়াকে পাঠানোর দরকার ছিল না। মধু মিয়াকে কেন পাঠানো হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমি ঝামেলা পছন্দ করি না। ইতি- আজহার উদ্দিন'।

বাদল চিঠি পড়া শেষ করে মধু মিয়ার দিকে তাকালো। মধু মিয়া তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বাদলের হঠাৎ মনে হলো, মধু মিয়ার চাদরের নিচে ভয়ঙ্কর কিছু একটা লুকিয়ে আছে। মধু মিয়া বাদলের দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'কি মাস্টার সাব, চইলা যাবো?' মধু মিয়ার এই সামান্য হাসি দেখেই বাদলের শিঁড়দারা কেঁপে উঠলো। সে মধু মিয়ার প্রশ্নের কোনো জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে ঘরে ফিরে এলো।

মধু মিয়া এসেছিল সপ্তাহখানেক হলো।

আজহার উদ্দিনের চিঠি নিয়ে বাদলের অদ্ভুত ধরনের প্রতিক্রিয়া হলো। ভয়ের বদলে তার বরং এক ধরনের স্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে- ভালো কিংবা মন্দ যাই হোক, আবছায়ার চেয়ে স্পষ্টতা ভালো। আজহার উদ্দিনের চেহারাটা অবশেষে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এই চেহারাটা এতদিন বাদলের কাছে অনাবিষ্কৃতই ছিল। বাদলের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। এখন লম্বা ছুটি। এই ছুটিতে বাদলের উচিত বিরামপুর ঘুরে আসা। কিন্তু বাদল খেয়াল করলো, কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার বিরামপুর যেতে ইচ্ছে করছে না। রাবেয়াকে সে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করছে। কারণটা কি? সে অনেক খুঁজেও তেমন কোনো কারণ খুঁজে পেল না। তবে সে তার দুলাভাই ফরিদের বিষয়টা নিয়ে চিন্তিত। এখনো কোনো খোঁজ বের করতে পারেনি। সে কি এই কারণে রাবেয়ার সামনে যেতে চাচ্ছে না?

আজকাল বাদলের ঘুমের খুব সমস্যা হয়। প্রায়ই মাঝরাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সারারাত আর ঘুম হয় না। বাদল চুপচাপ শুয়ে থাকে। টিনের চালে টুপটাপ শিশিরের শব্দ শোনে। কিন্তু আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। মাঝরাতে যথারীতি বাদলের ঘুম ভেঙে গেল। সে বালিশে কান চেপে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল। একসময় ফজরের আজান হলো। এবং ঠিক তখুনি বাদলের মনে হলো তার চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম। বাদল সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের ভেতর বাদল লাবণীকে স্বপ্ন দেখলো। সে দেখলো, শীতের রাতে কোনো এক বাড়ির উঠানে সে বসে আছ। আকাশে থালার মতো বিশাল চাঁদ। কুয়াশার ভেতর চাঁদের আলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। বাড়ির চারপাশ জুড়ে নারকেল গাছ। চাঁদের আলোয় উঠান জুড়ে

নারকেল পাতার নকশা। বাদল বসে আছে উঠানের একপাশে মাদুর পেতে। তার প্রচণ্ড শীত লাগছে। ঘর থেকে একটা চাদর নিয়ে এলে হয়। কিন্তু এই কুয়াশা মাখা নকশি জোছনা ছেড়ে তার কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এই সময় লাবণী আসলো। তার হাতে চাদর। সে চাদরটা বাদলের হাতে দিতে দিতে বলল, 'তোমার মনে আছে, তোমাকে আমি বাঁদর বলে খেপাতাম? তোমার বই খাতায় বাদল লেখা নামগুলো সব কেটে বাঁদর করে দিতাম।'

বাদল জবাব দেয় না। মৃদু হাসে। লাবণী হঠাৎ বাদলের হাত থেকে চাদরটা কেড়ে নেয়। তারপর বলে, 'তোমার জন্য একটা ধাঁধা আছে, ধাঁধার উত্তর দিতে পারলেই শুধু চাদরটা পাবে, না হলে পাবে না'।

বাদল বলে, 'কি ধাঁধা?'

লাবণী ঠোঁট টিপে হেসে বলে, 'রাতের ধাঁধা'।

বাদল বলে, 'ধাঁধার আবার রাত-দিন কি?'

'আছে, সব কিছুরই রাত-দিন আছে। এই যে জোছনা, এর সময় হচ্ছে রাত। সে দিন হলে থাকে না। দিনে থাকে অন্য জিনিস'।

'আচ্ছা, শুনি তোমার রাতের ধাঁধা?'

লাবণী বাদলের গা ঘেঁষে বসে। তারপর বাদলের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'মি. বাঁদর, বাঁদর আর চাদরের সাথে মিলিয়ে আরেকটা শব্দ আছে, সেই শব্দটা কি?' বাদল ঘুরে লাবণীর চোখের দিকে তাকায়। লাবণীর চোখ ভর্তি দুষ্টুমি। বাদল হঠাৎ হাত বাড়িয়ে লাবণীকে কাছে টানে। তারপর লাবণীর চুলের খোঁপা খুলে দেয়। লাবণী ফিসফিস করে বলে, 'কি মি. বাঁদর? সাথে সাথে বাঁদরামি শুরু হয়ে গেল?'

বাদল বলে, 'কই, না তো! এ তো ধাঁধার উত্তর'।

বাদলের ঘুম ভাঙলো বেলা করে। তাকে মোফাজ্জল হোসেন ডেকে উঠিয়েছেন। মোফাজ্জেল হোসেনের চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। বাদল অবশ্য কারণটা বুঝলো না। সে বলল, 'আপনি কি আমাকে অনেকক্ষণ থেকে ডাকছিলেন?'

মোফাজ্জল হোসেন এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'মানুষ যত ঝামেলা এড়ায় চলতে চায়, ঝামেলা ততই তার কান্ধে চাইপা বসে'।

'কি হয়েছে স্যার, স্কুলে কোনো সমস্যা?' বাদল সমস্যাটা বুঝতে পারছে না।

'আজহার সাহেবের মেয়ে আসছে। তোমার সাথে দেখা করতে চায়। আমি এমনিতেই আছি নানান যন্ত্রণায়। এর মধ্যে আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া। এখন আজহার সাহেব যদি এই কথা জানতে পারে, বুড়া বয়সে আমার চাকরিটা যাবে। মানসম্মানেরও বারোটা বাজাবে। কি করে আল্লাহপাক জানে'।

লাবণী এসেছে! মোফাজ্জল হোসেনের বাকি কথাগুলো আর বাদলের কানে ঢুকলো না। মোফাজ্জল হোসেন কোনো ভুল করছেন না তো! বাদল অবশ্য জানে, লাবণীর কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বাদলের হঠাৎ স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। সব ছাপিয়ে তার এক ধরনের অদ্ভুত অস্বস্তি হতে লাগলো। তার মনে হতে লাগলো, 'লাবণী তার স্বপ্নের বিষয়টা জানে!'

লাবণীর পড়নে হালকা নীল রঙের শাড়ি। শাড়ির উপরে কালো চাদর। তাকে কেমন বয়স্ক দেখাচ্ছে। বাদল লাবণীকে দেখে বড় রকমের হোঁচট খেলো। তার মনে হলো, তার দেখে আসা সেই লাবণী আর এই লাবণী এক না। অন্য কেউ। এই লাবণীকে বাদলের ভয় লাগছে। এই লাবণীর ভেতর যেন কিছু একটা আছে। যেটা বাদল ধরতে পারছে না।

লাবণী খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? ভয়ের কিছু নাই। আব্বা জানে না যে আমি এখানে আসছি। আমি মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। ফরিদপুরে। ভাবলাম ফেরার পথে আপনাকে দেখে যাই'।

বাদল হাসার চেষ্টা করলো, 'তুমি এত কষ্ট না করলেও পারতে। আমাকে খবর দিলেই হতো'।

লাবণী বাদলের কথার জবাব দিলো না। সে বলল, 'আপনি আবার ভাববেন না যে আমি আপনার জন্য চিরতরে এখানে চলে এসেছি। আমি একটু পরেই চলে যাবো। আপনাকে আমার একটা কথা বলার ছিল'। বলে লাবণী থামলো। তারপর বুক ভরে খানিকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমি খুব জঘন্য একটা কাজ করতে যাচ্ছি। মানুষ খুব অদ্ভুত প্রাণী। সে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করে। আমিও সম্ভবত সেইটাই করতে যাচ্ছি। আপনাকে আমি যতটুকু চিনি, আমার ধারণা, আপনার মনে হতে পারে, আমার এই জঘন্য কাজের জন্য আপনি দায়ী। কিন্তু এটা সত্য না। আমি আপনার কারণে কিছু করছি না'।

বাদল লাবণীর কথার কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু তার ভয়টা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। লাবণী আবার বলল, 'মা বলতো, মেয়ে মানুষের জেদ নাকি খুব খারাপ জিনিস। আমার জেদটা আমি কখনোই টের পেতাম না।

পাগলামিটা পেতাম। তখন ওই পাগলামিটাকেই জেদ ভেবে ভয় পেতাম। কিন্তু পাগলামীর চেয়ে জেদ অনেক ভয়ঙ্কর'। লাবণী তার জায়গা ছেড়ে উঠে এলো। খুব ধীর পায়ে হেটে বাদলের পাশে এসে বসলো। তারপর বলল, 'আপনাকে নিয়ে যেটা ছিল, সেটা পাগলামী। আমি সারাজীবন ওই পাগলামীটা পুষে রাখতে চেয়েছিলাম। আমি সেটা পেরেছি'। লাবণীর গলাটা কেমন ধরে এলো। সে সময় নিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলল, 'এই পাগলামীটা আমি সারাজীবন পুষে রাখতে পারবো। সারাজীবন। কেবল সেই পাগলীটাই আর থাকলো না'।

বাদল ঝট করে লাবণীর দিকে তাকালো। লাবণীর ঠোটজোড়া থরথর করে কাঁপছে। বাদল কি করবে ভেবে পেলো না। সে হঠাৎ শক্ত করে লাবণীর হাত চেপে ধরলো। টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়লো সেই হাতে। লাবণী ফিসফিস করে বলল, 'আপনাকে ছুঁয়ে দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। আজ সেই ইচ্ছেটা পূরণ হলো'।

লাবণী চুপ করে থাকলো। বাদলও। যেন নৈঃশব্দ্যের অনন্তকাল কেটে যাচ্ছে। সেই অনন্ত নৈঃশব্দ্য ভেঙে লাবণী খুব ধীরে মুখ তুলে বলল, 'জীবন এমন কেন?'

'কেমন?'

'এই যে, আমাদের মতোন। সব পেতে ইচ্ছা হয়, অথচ কিছুই পাওয়া হয় না'।

বাদল কখনো কাঁদেনি। যখন ছ'বছর বয়সে এক গভীর রাতে সে ঘুম ভেঙে দেখেছিল, সন্ধ্যেবেলা যে ঘরে সে ঘুমাতে গিয়েছিল, সেই ঘরখানা আর নেই। সেখনে প্রমত্ত আড়িয়াল খার হিংস্র ঢেউ। বুবুর কোলের ভেতর ঢুকে যেতে যেতে সে দেখেছিল, মা আর বাবা সেই ঢেউয়ের ভেতর ঘরের টিন খুঁজছে, রান্নার হাড়ি খুঁজছে, ধবধবে সাদা বাছুর আর লাল গাইটাকে খুঁজছে। ভোরের আলোয় যখন সে বুবুর কোলে জেগে উঠেছিল, তখন চারধারে অসংখ্য লোক। এক রাতেই আড়িয়াল খাঁর ঢেউ গ্রাস করেছে মাইলের পর মাইল গ্রাম। ঘাঁয়ের উপর মৃত মানুষের স্তুপ। সেই স্তুপে সে যখন বাবা আর মাকে চিনতে পেরেছিল, তখনও কাঁদেনি বাদল। সে কেবল আড়িয়াল খাঁর প্রমত্ত ঢেউয়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

বাদল এখনো তাকিয়ে রইলো। লাবণীর চোখের ভেতর। এখানেও ঢেউ। অন্য এক ঢেউ। বাদলের হঠাৎ মনে হলো, তার গলার ভেতরে কোথায় যেন দলা পাকানো শক্ত কিছু একটা আটকে আছে। বাদলের কি

কান্না পাচ্ছে? বাদল অবশ্য কাঁদলো না। বাদল কাঁদবে না। সে খুব ধীরে, আলতো হাতে লাবণীর গাল ছুঁয়ে দিলো। সেখানে জলের দাগ। বাদল সেই জলের দাগ ছুঁয়ে কেমন অন্য কেউ হয়ে গেল। অন্যরকম অচেনা কেউ। তার গলা ভারী হয়ে এলো। সে ভিজে গলায় ফিসফিস করে বলল, 'যা পাওয়া হয় না, তা-ই হয়তো আরও বেশি রয়ে যায় চিরকাল'।

বাদল কি কাঁদল?

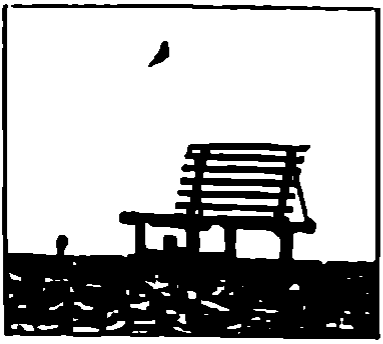

এই সপ্তাহজুড়ে কালুর সময়টা খুব ভালো গেল।

পরপর বড় তিনটা বিয়ের কাজ পেয়েছে জয়নাল কসাই। জয়নাল কসাইর সাথে মাংস কাটার কাজে থাকলো কালুও। হাতে কিছু অতিরিক্ত টাকাও এসেছে। কিন্তু অতিরিক্ত টাকা খরচ করার জায়গা কই কালুর? একলা জীবন। ঝুট ঝামেলা নেই। তারপরও কিছু পয়সাপাতি সে টুকটুক করে জমায়। এখন তার শেষ বয়স। কখন কি হয়ে যায় কে জানে? হুট করে বিছানায় পড়ে গেলে দেখার কেউ নেই। জমানো পয়সাগুলো যদি তখন কাজে দেয়। তবে আজকাল একটা ব্যাপার হয়েছে কালুর। সে হাটবাজার থেকে ফেরার সময় প্রায়ই এটা সেটা কেনে। দু-চার টাকার বাতাসা কিংবা সন্দেশ। হাওয়াই মিঠাই। নারকেলের লাড্ডু। এসবই রতনের জন্য। রতনের সাথে তার বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়েছে। বয়সের এমন আকাশ পাতাল ফারাক তাতে বাঁধা হতে পারেনি।

আজও কালু রতনের জন্য খাবার নিয়েছে। বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার সময় কলাপাতায় করে খানিকটা গরুর মাংস, মুরগীর শালুন আর পোলাও। তার চিন্তা ছিল, বাড়ি ফেরার পথে রতনকে দিয়ে যাবে। সমস্যা হচ্ছে বিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে অনেক রাত হয়ে গেল কালুর। খাবারের পুটলি হাতে নিয়ে কালু দাঁড়িয়ে আছে। সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কি করবে। এত রাতে কি রতনদের বাড়িতে কেউ জেগে আছে? জেগে থাকার কথা না। কিন্তু খাবারগুলো নষ্ট করতেও মন চাইলো না কালুর। সে তার বিশাল দা দু'খানা চটের ব্যাগে ভরে নিয়ে হাঁটা দিলো। রতনদের বাড়িতে পৌঁছাতে কতক্ষণ লেগেছে কালু জানে না। তবে এখন প্রায় মাঝরাত। শীতের রাতেও তার গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝড়ছে। সে বেশ জোর কদমে হেঁটে এসেছে।

বাঁশের বেড়া চুইয়ে কুপির আলো আসছে বাইরে। কালু খানিকটা অবাক হলো, এত রাতেও ঘরে বাতি জ্বলছে! সে গলা চড়িয়ে রতনকে ডাকলো। একবার ডাকতেই ভেতর থেকে জবাব দিলো রাবেয়া।

'কে? কে ওইখানে?' রাবেয়ার কণ্ঠে স্পষ্ট ভয়।

'আমি কনু, মা। দুয়ারখান খোলো। দাদাভাইর জন্য দুইটা পোলাও ভাত আনছি।' কনু গলা নামিয়ে জবাব দেয়। কিন্তু এতরাতে এসেছে বলে তার এক ধরনের অস্বস্তিও হতে থাকে। রাবেয়ার চোখে ঘুম নেই। ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তার চোখ জুড়ে। অজস্রবার সে চোখ বুজলেই আজেবাজে স্বপ্ন দেখছে। প্রতি রাতে যা ঘটছে, তা সে কাকে বলবে? কাউকেই তার বিশ্বাস হয় না। রাতে রাতে জেগে সে এক অনিশ্চয়তার অপেক্ষা করে। সেই অনিশ্চয়তার নাম কঠিন। কিন্তু অনিশ্চয়তার বিশ্বাস কি?

রাবেয়া নাতিক বাবুকে ডেকে তোলে। রতন ঘুমাচ্ছে। নাতিক বাবু উঠে দরজা খুলতে গেলে বাধা দেয় রাবেয়া, 'আমার ডর লাগে আব্বা'।

নাতিক বাবু বলেন, 'কনুরে কিসের ডর বউ?'

রাবেয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে, 'জানি না আব্বা। রাইত হইলেই আমার ডর লাগে। সব কিছুরেই ডর লাগে আব্বা। নিজের ছায়ারেও ডর লাগে। কাউরেই বিশ্বাস হয় না।' নাতিক বাবু রাবেয়ার মাথায় হাত রাখেন, 'ডরাইও না বউ। কনুরে ডরানোর কিছু নাই। সে মানুষ ভালো'।

রাবেয়া ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, 'মানুষ চেনা বড় কঠিন আব্বা'।

নাতিক বাবু কোনো কথা বলেন না। তিনি ঘরের দরজা খোলেন। কনু ঘরের সামনে খাবার গামছার মধ্যে আড়াল করে বসে আছে। তার কাঁধের ঝুলির ব্যাগটি পাশে রাখা। ব্যাগের ভেতর থেকে নারকেল চন্দ্রপুলির মাথা উঁকি দিচ্ছে। কনুর হাতে বনপাকড়ের পুঁটলি।

'এত রাইতে কষ্টকইরা আসলিরে কনু?' নাতিক বাবু কনুর সাথে সহজভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন। যাতে রাবেয়ার ভয় খানিক কাটে।

'আব্বা কিয়া নারের কইছার বিয়া ছিল জুলফিকরের। সেইখান থেকে আসলাম। রতনের জন্য দুইটা ভাত নিয়া আইছি আর দুই টুকরা মাংস'।

'রতন তো ঘুমাইয়া পড়ছে কনু'।

'ও ভাইজান। ঠিক তো আছেন তাইলে। [illegible] দুপুরের [illegible] মনে হয়। কি করবো বলেন, [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] একটা কথা [illegible] [illegible]'।

নাতিক বাবু কনুর হাত থেকে খাবারের পুঁটলিটা নিতে নিতে বলেন, '[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]'।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলে, 'আচ্ছা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] খুব। এখন আর

এত পথ হাঁইটা না যাই। বাকি রাইতটুক এইখানেই কাটাই দেই। সকাল হইলে বাড়িত যাবো'।

লতিফা বানু কিছু বলেন না আর। তিনি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেন। কানু খড়ের গাদার ভেতর ঢুকে যায়। এ ক'দিন শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধাটুনি গেছে। তার চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আসে। শেষরাতের ঠাণ্ডাটা আরো জাঁকিয়ে বসেছে। কানু ঘুমের ভেতরই খড় টেনে শরীরের বাকি অংশটুকু ঢেকে দেয়।

রাবেয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। হঠাৎ ঠকঠক শব্দে তার ঘুম ভাঙলো। সাথে প্রবল আতঙ্ক। তার মনে হলো কেউ একজন তার হাত ধরে টানছে। শক্ত লোমশ একজোড়া হাত। রাবেয়া ঝট করে চোখ মেললো। পুরো ঘর জুড়ে গাঢ় অন্ধকার! কেরোসিনের কুপিটা নিভে গেছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে রাবেয়ার মুখে লাগলো। সে সেই গাঢ় অন্ধকারেও বুঝলো, তার সামনের বাঁশের বেড়াটা নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লম্বা ছায়ামূর্তি। ভয়ে, আতঙ্কে রাবেয়া যেন মুহূর্তেই জমে গেল। সে প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকলো, 'আম্মা, ও আম্মা'। কিন্তু সেই চিৎকার লতিফা বানুর কান অবধি পৌঁছালো না। একটা লোমশ হাত রাবেয়ার মুখ চেপে ধরলো। তারপর টেনে নিয়ে গেল বাইরের অন্ধকারে। যেন অসুরের শক্তি তার গায়ে। রাবেয়াকে অন্ধকারে কোপের ভেতর শুইয়ে দিলো লোকটা। টেনে রাবেয়ার শাড়ির আঁচল খুলে ফেলল। রাবেয়া প্রাণপণ চেষ্টা করছে তার মুখ থেকে হাতটা সরাতে। কিন্তু পারছে না। লোকটা বা হাতে প্রচণ্ড চড় বসালো রাবেয়ার গালে। রাবেয়ার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। মনে হলো তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। রাবেয়া হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। লোকটা অন্ধকারে হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো রাবেয়ার উপর। রাবেয়া আর কোনো শব্দ করলো না। নড়লো না। সে নিঃসাড় পড়ে রইলো মাটিতে। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে সে কেবল ফিসফিস করে ডাকলো, 'রতনের আব্বা। ও রতনের আব্বা'।

রাবেয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে রতনের আব্বা এলো না। কিন্তু কেউ একজন এলো। খুব ধীরে একজোড়া পা এসে দাঁড়ালো অন্ধকারে। সেই অন্ধকারে রাবেয়া মানুষটার মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু মানুষটার হাতের অতবড় দা খানা তার চোখ এড়ালো না!

ভোরের আলো ফুটেছে।

ফজলুর শরীরটা পড়ে আছে হোগলা পাতার মাদুরে। শরীর থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন। কালু কোপটা যে খুব জোরে দিয়েছিল তাও না। অন্ধকারে জোরে কোপ মারায় বিপদ ছিল। রাবেয়ারও ক্ষতি হতে পারতো। কিন্তু যতটুকু জোরে সে কোপ দিয়েছে, তাতেই ফজলুর শরীর থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে গেছে। টরকী বন্দরের রঘু কর্মকার তাহলে এই দা সম্পর্কে ভুল কিছু বলেনি। সে বলেছিল, 'যেই দাও বানাই দিলাম, এই দাওয়ের কর্ম বাঁশ কাটা না, এই দাওয়ের কর্ম মাইনসের কল্লা কাটা। কোপ পুরা দেওনের দরকার নাই। গলায় ছোঁয়াইলেই কর্ম সাধন'। কর্ম সাধন হয়েছে। কর্ম সাধন শেষে কালু বসে আছে সুপারি গাছে হেলান দিয়ে। সে পালায়নি। কিছুক্ষণ পরই পুলিশ আসবে। তার কি ফাঁসি হবে? হওয়ারই কথা। সে কুপিয়ে মানুষ খুন করেছে। কালুর হঠাৎ মনে হলো, সে কি আসলেই মানুষ খুন করেছে? এই প্রশ্নের উত্তর নেই। কালুর লম্বা দা'খানা পড়ে আছে ফজলুর লাশের পাশে। দা'য়ের শরীর জুড়ে জমাট কালো রক্ত। রক্ত খেতে এসে জুটেছে রাজ্যের মাছি। কালু সেদিকে তাকিয়ে রইলো। বাড়ির উঠান জুড়ে অসংখ্য মানুষ। তারা সবাই কালুকে দেখছে। তাদের চোখ জুড়ে ভয়। কালু হঠাৎ হাসলো। অদ্ভুত হাসি। সেই হাসির অর্থ কি কে জানে!

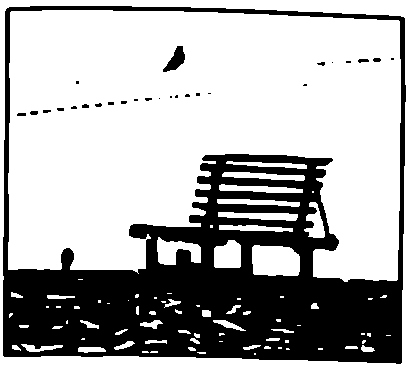

আজ লাবণীর বিয়ে।

গত সপ্তায় মন্ত্রী সাহেব সপরিবারে এসেছিলেন। তাদের লাবণীকে অসম্ভব পছন্দ হয়েছে। আজহার উদ্দিনকে চমকে দিয়ে পাত্রপক্ষের সাথে অস্বাভাবিক রকমের ভালো আচরণ করেছে লাবণী। এমনকি পাত্রের সাথে সে খানিকক্ষণ আলাদা সময়ও কাটিয়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার একটা ব্যাপার আছে। সেটা নিজেরা নিজেরা সেরে ফেলাই ভালো। আজহার উদ্দিন মনে মনে দারুণ খুশি হয়েছেন। লক্ষণ শুভ।

দুপুরবেলা দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছিলেন আজহার উদ্দিন। শেষ কিছুদিন মন এবং শরীরের উপর দিয়ে বেশ ধকল গেল। আজকের পর থেকে তিনি অনেকটাই নিশ্চিন্ত। যদিও জোহরার সমস্যাটা এখনো সারেনি। বরং বাড়াবাড়ি রকমের বেড়েছে। সে এখন মোটামুটি বদ্ধ উন্মাদ। আজহার উদ্দিন তাকে কিছু দিনের জন্য বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লাবণীর বিয়ের ঝামেলাটা শেষ হলে নিশ্চিন্তে জোহরার সমস্যা নিয়ে বসা যাবে।

বাড়িভর্তি লোকজন। আজহার উদ্দিন বরযাত্রী আসার অপেক্ষা করছেন। খানিক পরেই বিয়ের অনুষ্ঠান। লাবণী খুব আগ্রহ নিয়ে তার বান্ধবীদের সাথে বাইরে সাজতে গিয়েছে। কিন্তু ওরা ফিরতে এত দেরী করছে কেন? বরযাত্রী তো যে কোনো সময় চলে আসবে! আজহার উদ্দিনের ভেতরে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। এই উত্তেজনা অবশ্য আনন্দের। তিনি কড়া জর্দা দিয়ে পান মুখে দিলেন। আজকাল জর্দার ঝাঁঝও কমে যাচ্ছে! বৈঠকখানায় কিছু একটা নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড বেঁধেছে। এখান থেকেই স্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। বরযাত্রী কি চলে এলো নাকি? মধু মিয়া কই? এরা আসলে কোনো কাজের না। মধু মিয়ার দায়িত্ব ছিল তাকে খবর দেয়ার অথচ এখন মধু মিয়ার নিজেরই কোনো খবর নেই। আজহার উদ্দিন হন্তদন্ত হয়ে দোতলার বারান্দা থেকে বের হতে যাবেন, এই মুহূর্তে মধু মিয়া ঢুকলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, তার ওপর দিয়ে বড় ধরনের কোনো ঝড় ঝাপ্টা বয়ে

গেছে। সে হড়বড় করে কিছু একটা বলল। আজহার উদ্দিন সেই কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলেন না। তিনি ধমক দিয়ে মধু মিয়াকে থামালেন, 'যা বলার গুছিয়ে বল মধু। হইছে কি? বরযাত্রী চলে আসছে?'

মধু মিয়া সাথে সাথে কোনো জবাব দিল না। তার বুক হাঁপড়ের মতো ওঠানামা করছে। সে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। তার হাতে লাল রঙের গামছা। সে সেই গামছা দিয়ে বারবার মুখ মুছছে। মুখ মুছতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল, তার হাত-পা কাঁপছে। সে বুঝতে পারছে না, এই খবর সে আজহার উদ্দিনকে কিভাবে দিবে!

আজহার উদ্দিন আবারো ধমক দিলেন, 'কি হইছে মধু? কথা বলস না কেন?'

'লাবণী আফা নাকি বিয়া কইরা ফালাইছে'। মধু মিয়া ফট করে বলে ফেলল। কিন্তু কি বলল, কিভাবে বলল তা যেন সে নিজেই বুঝতে পারল না। আজহার উদ্দিনও মধু মিয়ার কথার কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। লাবণী বিয়ে করে ফেলেছে মানে কি? এখনো তো বরযাত্রীই আসে নাই। এমনকি কাজী সাহেবও না। মধু এইসব আবোল-তাবোল কি বলছে!

আজহার উদ্দিনের মাথা চিনচিনে ব্যাথা শুরু হয়েছে। তার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমতে শুরু করেছে। তিনি এবার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'যা বলার পরিষ্কার কইরা বল মধু, পরিষ্কার। কাজী সাহেব আসছে?'

মধু মিয়া কোনো মতে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর খুব সময় নিয়ে, ধীরে সুস্থে বলল, 'লাবণী আফা আসছে। বাইরে বৈঠকখানায় বইসা আছে। তার লগে আশফাক সাব। লাবণী আফা নাকি আশফাক সাবরে কাজী অফিসে গিয়া বিয়া করছে'! আজহার উদ্দিন বুকে একটা ধাক্কার মতো খেলেন। তার হঠাৎ মনে হলো তিনি মধু মিয়ার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। বুকের বা দিকটা জুড়ে তীব্র ব্যাথা! সেই ব্যাথায় আজহার উদ্দিন শ্বাস নিতে পারছেন না। তার দমবন্ধ হয়ে আসছে। তিনি হতভম্ব চোখে মধু মিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মধু মিয়া আবার বলল, 'লাবণী আফায় বলতেছে আপনেরে বৈঠকখানায় যাইতে। সে আর আশফাক সাব নাকি আইজকা এই বাড়িতেই থাকবো। লাবণী আফায় বলছে, আপনেরে কদমবুসি না কইরা সে নাকি এই বাড়িত ঢুকবো না'।

আজহার উদ্দিনের মনে হলো তিনি আর কানে শুনছেন না। চোখে দেখছেন না। মুহূর্তের মধ্যে তার চারপাশের বাতাস যেন ঘন আর বিষাক্ত

হয়ে গেছে। তিনি শ্বাস নিতে পারছেন না। তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। বুকের বা দিকটায় কেমন চিনচিন করে ব্যাথা হতে থাকল। আজহার উদ্দিন কোনোমতে উঠে দাঁড়ালেন। তার পা জোড়া কাঁপছে। তিনি বারান্দার রেলিংটা ধরে দাঁড়ালেন। তার দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে আসছে। সেই ঝাপসা চোখে আজহার উদ্দিন দেখলেন গেটের বাইরে দূরে রাস্তায় সাদা গাড়ির সারি। বরযাত্রী! মন্ত্রী সাহেব বরযাত্রী নিয়ে চলে এসেছেন! গাড়িগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। একটা, দুইটা, তিনটা...। আজহার উদ্দিন আর গুণতে পারলেন না। সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো গাড়ি। সাথে ব্যান্ড পার্টি। সেই ব্যান্ড পার্টির নানান সুরের বিয়ের গীত বাজাচ্ছে। এত দূর থেকেও আজহার উদ্দিন ব্যান্ড পার্টির সুর স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে যেই সুরটি বাজছে এই সুরটি আজহার উদ্দিনের চেনা। খুব চেনা। কিন্তু এখন তিনি সুরটা ধরতে পারছেন না। তার খুব হাসফাস লাগছে। তিনি চেষ্টা করছেন গানটা মনে করতে।

পেয়ারা গাছের ডালে মা চড়ুই আর তার ছানাটা খেলছে। মা চড়ুই চেষ্টা করছে ছানাটাকে ধরতে। কিন্তু পারছে না। ছানাটা টুক করে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। আবার কাছে আসছে। আবার সরে যাচ্ছে। মা চড়ুইটা অবশ্য হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্রী না। সেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে ধরতে। কিন্তু পারছে না। ছানাটা কেমন চোখের পলকে সরে যাচ্ছে। এই খেলা কতক্ষণ চলবে কে জানে! আজহার উদ্দিনের হঠাৎ মনে হলো, জীবনটা আসলে একটা খেলা। এই খেলার মতোই লুকোচুরি খেলা। ধরা না পড়ার খেলা। পালিয়ে বেড়ানোর খেলা। কিন্তু এই খেলায় কখনো না কখনো ধরা পড়তেই হয়।

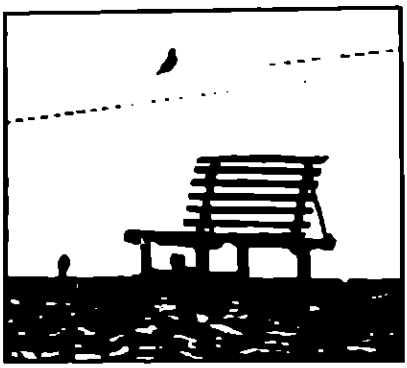

গভীর রাত। ঠক ঠক শব্দে রাবেয়ার ঘুম ভাঙলো।

আজকাল রাতে তার ঘুম হয় না। চোখ বুজলেই ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে সে। দুঃস্বপ্নের একটা পর্যায়ে গিয়ে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন ভয়ে হাত পা কাঁপতে থাকে। এখনো তার হাত-পা কাঁপছে। বুক ধুকফুক করছে। রাবেয়া শোয়া থেকে উঠে বসল। জগ থেকে ঢেলে পানি খেল। কিন্তু তৃষ্ণা কিছু কমলো বলে মনে হলো না। আচ্ছা, সে কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? স্বপ্নের ভেতরই কি সে ঠক ঠক ঠক শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল? ঘুম ভাঙা রাবেয়ার মনে হলো, সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্ন। স্বপ্নের ভেতরই ঠক ঠক ঠক শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল সে। প্রবল আতঙ্ক নিয়ে রাবেয়া তাকিয়ে রইলো ঘরের অন্ধকারে। যেন ওখানে ওঁৎ পেতে আছে ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণী। এখুনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর ছিঁড়েখুড়ে খাবে। অন্ধকারকে রাবেয়ার ভয়। তীব্র ভয়।

আচ্ছা, ভোর হতে আর কত দেরী?

রাবেয়া আর শুতে গেল না। বাকি রাতটা সে জেগেই কাটাবে। আজ আর দুঃস্বপ্ন দেখতে চায় না সে। এই সময়ে আজানের শব্দটা শুনলো রাবেয়া। দূরে কোথাও মসজিদে আজান হচ্ছে। আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম। আসসালাতু খায়রুম মিনান নাউম। ভোর হয়ে এসেছে! রাবেয়ার কেন যেন মনে হলো, তার ভয়টা আর নেই। কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি তার সারা শরীর জুড়ে। সে ধীর পায়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিলো। বাইরে গাঢ় কুয়াশা। সেই কুয়াশায় যেন গলে গলে পড়ছে দ্বাদশীর চাঁদ। রাবেয়ার আচমকা মনে হলো, ওই ধবধবে সাদা কুয়াশার ভেতর কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। কে সে? একটা ছিপছিপে লম্বা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি ধীরে এগিয়ে আসছে। খুব ধীরে। রাবেয়ার ভয় পাবার কথা ছিল। কিন্তু সে একটুও ভয় পেলো না। একটুও না। বরং সে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালো। মানুষটা ধীর পায়ে হেঁটে আসছে। এই হাঁটার ভঙ্গি রাবেয়ার চেনা। রাবেয়ার হঠাৎ কি হলো কে জানে! সেও ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর নেমে

এলো বাইরে। সেখানে উঠান জুড়ে ধবধবে চাঁদের আলো। সেই চাঁদের আলোয় ধীর পায়ে হেঁটে আসা মানুষটার দিকে তার ছুটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাবেয়া গেল না। সে তার গায়ের চাদরটা শক্ত করে জড়িয়ে নিলো। তারপর নেমে এলো দ্বাদশীর চাঁদ মাখা ঘন কুয়াশার ভেতর। তারপর মিশে গেল কুয়াশায়, মিশে গেল জোছনায়। মানুষটা হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলো। ছোট্ট ডাক। খুব ছোট, 'রাবু'।

রাবেয়া সেই ডাকের জবাব দিলো না। তবে থামল। মানুষটা ধীর পায়ে রাবেয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মাথা ভর্তি লম্বা চুল। মুখভর্তি ঘন দাড়ি। সে সেই ঘন দাড়ির আড়াল থেকে কেমন অদ্ভুতভাবে হাসলো। রাবেয়া দেখল। সেই হাসি! সেই মানুষ! তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল! যেন জলোচ্ছ্বাস ভেঙে পড়ল চোখে। রাবেয়া আচমকা মুখ ফিরিয়ে নিল। এই জল সে কাউকে দেখাতে চায় না। কাউকে না। কাউকেই না। কিন্তু মানুষটা আলতো হাতে আঙুলের ডগায় সেই জল ছুঁয়ে দিল। তারপর গভীর মমতায় ফিসফিস করে বলল, 'তুই কই যাস বউ?'

রাবেয়া জবাব দিল না। এই প্রশ্নের জবাব তার কাছে নেই। সে দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়েই থাকল। পাশেই কোথাও একটা দু'টা পাতা ঝড়ল। ক'ফোটা শিশির। টুপটাপ শব্দ হলো কোথাও। কোথাও নিশাচর পাখি ডাকল। কিন্তু রাবেয়া দাঁড়িয়েই রইল। চুপচাপ। স্থির। ভোরের বাতাসে রাবেয়ার হঠাৎ কেমন শীত শীত লাগছে। কি করবে সে? কোথায় যাবে? রাবেয়া গুটিগুটি পায়ে মানুষটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সেই গা-ভর্তি ওম। সেই গা-ভর্তি ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণ রাবেয়ার চেনা। অনেকদিনের চেনা। মানুষটা তার চাদরের ভেতর থেকে লম্বা হাত দুখানা বের করল। রাবেয়ার কেমন জানি লজ্জা লাগছে। অদ্ভুত লজ্জা। কিন্তু সে সেই লম্বা হাতের ভেতর ঢুকে গেল। মানুষটা রাবেয়াকে শক্ত করে বুকের সাথে চেপে ধরল। রাবেয়া গুটিগুটি মেরে ছোট্ট পাখির মতো সেই বুকের ভেতর ঢুকে গেল।

তার হঠাৎ মনে হলো, এই মানুষটাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। কোথাও না।

**সাদাত হোসাইন**

জন্ম : ২১ মে, ১৯৮৪

স্নাতকোত্তর : নৃবিজ্ঞান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুটো ইচ্ছে নিয়ে স্বপ্নযাত্রার শুরু। এক. খেয়ানৌকার মাঝি হওয়া, দুই. নিজের নামটি ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া। মাদারীপুরের কালকিনি থানার কয়ারিয়া নামের যে গ্রামে জন্ম, তার পাশ দিয়েই তিরতির করে বয়ে গেছে ছোট্ট এক নদী। খেয়ানৌকার মাঝি হওয়ার স্বপ্নটা তাই সত্যি হওয়াই ছিল সহজ। কিন্তু হলো উল্টোটা। পূরণ হলো দ্বিতীয় স্বপ্নটি! সাদাত হোসাইন হয়ে গেলেন লেখক। *ভাষাচিত্র* থেকেই প্রকাশিত হয় তার তোলা আলোকচিত্রের গল্পের বই 'গল্পছবি' এবং ছোটগল্পের বই 'জানালার ওপাশে'। যা প্রশংসা কুঁড়িয়েছে পাঠক মহলে। শুধু লেখালেখিই নয়, নিজের স্বপ্নের সীমানাটাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণেও। চ্যানেল নাইনে প্রচারিত তার 'বোধ' শর্টফিল্মটি রীতিমত প্রশংসার ঝড় তুলেছে সমালোচক ও দর্শক মহলে। সম্প্রতি আলোকচিত্র, লেখালেখি এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য 'ক্বালচারাল এচিভমেন্ট' ক্যাটাগরিতে জিতেছেন 'জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যশনাল অ্যাওয়ার্ড ২০১৩'।

প্র চ্ছ দ

মির্জা মুজাহিদ

ISBN : 978-984-90873-3-5